বালক বিজয়কৃষ্ণ

বা

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাল্যচরিত।

শ্রীসীতানাথ গোস্বামী প্রণীত

শান্তিপুর।

আশ্বিন—১৩২১ সাল।

মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রিণ্টার—কে, সি, চক্রবর্ত্তী,
গিরীশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৫২নং, সুকিয়া ষ্ট্রীট্‌,—কলিকাতা।



প্রভুপাদ শ্রীশ্রী৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

Works

উৎসর্গ

মা !

তোমার স্মৃতির
সহিত এক মহাপুরুষের
নাম সংযুক্ত থাকিবে কেবল
এই আনন্দ আমাকে এই দুঃসাহসিক
কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়াছে ; আমাদের
বংশের এই মহাত্মার প্রতি স্বতঃ উৎসারিত যে
ভক্তি ও প্রীতির অমিয় নির্ঝর ধারা ক্ষরিত হইয়া তাঁহারই
পবিত্র চরণ স্পর্শে ধন্য ও পূত হইতে চায়,—তাহারই কয়েক
কণিকা মস্তকে ধারণ করিয়া নিজকে সৌভাগ্যবান মনে
করি এবং দিব্যধাম-বাসিনী সৌভাগ্যবতী তোমাকে ইহার
অংশদানে অধিকতর সৌভাগ্যবতী করিবার জন্য আমার এই
দীন, ব্যর্থ প্রথম প্রয়াসখানি তোমার করপুটে অর্পণ করিলাম।

ভবদীয় সেবা-ভাগ্য-বিচ্যুত
সীতানাথ।

শ্রীঝুলন-পূর্ণিমা-রজনী।
১৩২১ সাল।

শান্তিপুর ধাম।
আতা বুনিয়া গোস্বামিবাটী।

নিবেদন।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনচরিত অনেকেই লিখিয়াছেন, তথাপি আমার মত অক্ষম ও নগণ্য ব্যক্তি এইরূপ একটী দুরূহ কার্য্যে কেন প্রবৃত্ত হইল, তাহার কারণ এই যে, মহৎ ব্যক্তির মহত্ত্বের কথা যত অধিক বিঘোষিত হয়, জগতের পক্ষে ততই উহা কল্যাণপ্রদ। শ্রীহরি-নামসঙ্কীর্ত্তনের মত উহা গায়ক ও শ্রাবক উভয়েরই মনে তুল্য প্রীতির সঞ্চার করে। এতদ্ব্যতীত এই মহাপুরুষের গুণগ্রাম বিশাল নন্দন উদ্যানের প্রস্ফুটিত কুসুমরাশির মত; তাহার সমস্ত কুসুম স্তবকগুলি চয়ন করা দু'এক জনের সাধ্যাতীত। কেহ পারিজাতগুলি সব তুলিয়া লইয়া পার্শ্বের হরিচন্দন ছাড়িয়া গিয়াছেন,—উপেক্ষা করিয়া নাও হইতে পারে,—হয় ত দেখিতে পান নাই; কাহারও বা সাজি ভরিয়া গিয়াছে এবং কেহ বা ক্লান্তির জন্য চয়ন করিতে বিরত হইয়াছেন।

বাস্তবিক, প্রভুপাদের জীবনের প্রত্যেক সামান্য কথা, প্রত্যেক সামান্য বিবরণ পর্য্যন্ত এত মধুর যে, ভক্তগণের মনে তাহা তাঁহার কীর্ত্তি-কলাপের মত একই রূপ আনন্দের উদ্রেক করে। তাহা ছাড়া, ক্ষুদ্র কার্য্যাবলীদ্বারা মানবচরিত্র যত স্পষ্ট বুঝা যায়, বৃহৎ কার্য্যদ্বারা তত বুঝা যায় না। বড় কাজ লোকে ভাবিয়া চিন্তিয়া করিয়া থাকে; কিন্তু সামান্য কাজ লোকে ওজন করিয়া সব সময় করিতে পারে না। "ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে সূর্য্যরশ্মির কনকচ্ছটা যেরূপ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ মানবজীবনের চিত্র তাহার ক্ষুদ্র কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া ভালরূপে চিত্রিত হইয়া উঠে" * ইহা অতি সত্য।

---

* Smiles character.

আমরা প্রথমে তাঁহার বাল্যচরিত্র চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কারণ, ভবিষ্যজীবনের বর্ণগন্ধোচ্ছ্বসিত পূর্ণ বিকাশের প্রথম কলিকাটুকু শৈশবেই সুগন্ধ বিস্তার করিয়া থাকে। সূর্য্যের মধ্যাহ্ন দীপ্তির প্রথম আভাস বালারুণোদয়ের প্রথম রক্তিমচ্ছটাতেই প্রতিভাত হয়।

এই জন্যই সেই মহাপুরুষের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া নির্গুণ ও ভক্তি-বিহীন আমি, তাঁহার বাল্যজীবনী আজ সর্ব্বপ্রথম সাধারণে প্রকাশ করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি।

যে সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া এই পুস্তিকা লিখিত হইল, বোধ হয়, এখানে তাহার পরিচয় প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রভুর শৈশব-কাল পিতৃগৃহ শান্তিপুরে অতিবাহিত হইয়াছিল; অতএব স্থানীয় লোক-ব্যতীত অপর কাহারও নিকট সে সকল কাহিনী সবিশেষ অবগত হইবার কোন উপায় নাই।

ছেলেবেলা হইতেই আমি আমার নূতন দিদি, পিতামহী, (গোস্বামী মহাশয়ের খুড়ীমাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া) এবং অন্যান্য বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী-গণের নিকট হইতে তাঁহার গল্প শুনিতাম; ইঁহারা সকলেই এখনও জীবিতা রহিয়াছেন। তাঁহার জীবন-প্রভাতের সেই মনোরম কাহিনী আমাকে অনেক সময় উন্মত্তবৎ করিয়া তুলিত; কতবার ইচ্ছা হইত যে, সে সমুদয় লিপিবদ্ধ করি; কিন্তু যখনই আমার নিজের ক্ষুদ্র শক্তি ও সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি পড়িত, তখনই সে প্রবৃত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত। তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, উহা আবার কোন দিন গ্রন্থাকারে পরিণত হইবে।

মনের এইরূপ অবস্থার সময়ে প্রভুপাদের প্রিয় শিষ্য দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বসু মহাশয়দ্বয় আমাকে তাঁহার সমগ্র শৈশব কাহিনীগুলি সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করায়, আমি ভগবানের নাম লইয়া সভয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

গোস্বামী মহাশয়ের অধ্যাপক শতায়ুর্ব্বৃদ্ধ পণ্ডিত বনমালী ভট্টাচার্য্য এবং শৈশবসহচর বিবিধগ্রন্থপ্রণেতা পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী, ভক্তিভাজন গোলোককিশোর, প্রভুপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন, মন্ত্রদাতা পণ্ডিত-কুলতিলক কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী তর্করত্ন প্রভৃতি মহাশয়গণের নিকট হইতে আমি যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, ইঁহাদিগের মধ্যে একমাত্র তর্করত্ন মহাশয় ব্যতীত অদ্যাপি সকলেই জীবিত রহিয়াছেন। নিজেদের সাংসারিক নানাবিধ অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া ইঁহারা যেরূপ সাগ্রহে ও সানন্দে আমাদিগের নিকট তাঁহার মধুময় পবিত্র জীবনকথা বলিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়। তাঁহাদিগের এই সাহায্য না পাইলে আজ এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সেই জন্য সর্ব্বপ্রথমে আমি তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিতেছি।

এই পুস্তক প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি আমি নানাপ্রকারে দৈবনিপীড়িত হইয়াছি। আমার পুস্তক প্রকাশের প্রধান উৎসাহদাত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী জননী দেবীর অকাল বিয়োগ আমার জীবনের সমস্ত আশা-ভরসা নষ্ট করিয়াছে। তৎপরে ধর্ম্মনিষ্ঠ, মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত ব্রজের চাঁদ গোস্বামী খুল্লতাত মহাশয়কেও অকালে হারাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বহুবিধ বৈষয়িক বিপ্লবে বিজড়িত থাকিয়া দারুণ মনঃপীড়া ভোগ করিতেছি। সর্ব্বোপরি গোস্বামী মহাশয়ের মহাদান, তাঁহার আরাধ্য দেবতা ৺শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউর শ্রীমন্দির পতনোন্মুখ ও ভোগমন্দির, নহবৎখানা প্রভৃতি ভূমিসাৎ হওয়ায়, আমার হৃদয়ের সুখ ও শান্তি তিরোহিত হইয়াছে। এই সকল কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়া মাদৃশ অনুপযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই দুরূহ ও দুঃসাধ্য ব্যাপারসম্পাদনে যে পদে পদে ত্রুটি লক্ষিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যদি কখনও ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তখন সাধ্যমত প্রতীকারের চেষ্টা করিব।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া অনেকেই আহ্লাদ প্রকাশ করেন এবং

উহা ছাপাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। পরিশেষে মনোরঞ্জন বাবুর উদ্যোগে, তাঁহার প্রদত্ত ভূমিকা লইয়া উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। প্রার্থনা করি, ৺শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের চরণে তাঁহার মতি অচলা হউক।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যাঁহাদের সাহায্য পাইয়াছি, তন্মধ্যে আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল লাহিড়ী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যেরূপ দায়িত্বপূর্ণ নানাজনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও প্রবল উৎসাহসহকারে আমার সহিত গোস্বামী মহাশয়ের বাল্য-বন্ধুগণের নিকট গমন করিয়া হৃদয়ে নব বলের সঞ্চার করিতেন তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। বিশেষতঃ, তাঁহার সাহায্য না পাইলে গোস্বামী মহাশয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত বনমালী ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার মন্ত্রদাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী তর্করত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণী সংগৃহীত হইত না। এতদ্ব্যতীত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ অতুল্য-কুমার প্রামাণিক, গোস্বামী মহাশয়ের পিতৃভবনসংলগ্ন বাল্যলীলাস্থলীর একটী স্কেল ড্রয়িং করিয়া আমাকে বিশেষরূপে উপকৃত করিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে গোস্বামী মহাশয়ের ভাগীনেয় দেশহিতৈষী কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সান্যাল, বি, এ ও আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু, সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, মহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, তাঁহারা উভয়েই বিশেষ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধন করিয়া ও গ্রন্থখানির উৎকর্ষবিধানের জন্য সুপরামর্শ দানে বাধিত করিয়াছেন।

বিনীত

গ্রন্থকার।

আতাবুনিয়া গোস্বামীবাটী।

বা

প্রভুপাদ শ্রীশ্রী৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাল্যলীলা-নিকেতন

শান্তিপুর।

ক—প্রভুপাদের দাতব্য চিকিৎসালয়।

খ—৺গোপী মাধব গোস্বামীর গৃহ বা প্রভুপাদের উপাসনাগার।

গ—৺গোপী মাধবের রন্ধন শালা।

ঘ, ঙ—ঐ রোয়াক্ ও কূপ।

চ—প্রভুপাদের চিকিৎসালয়ের পৈঠা।

ছ— ঐ রোপিত বিল্ববৃক্ষ।

জ— ঐ ঐ

ঝ—পায়খানা।

ঞ—প্রভুপাদের রোপিত বকুল বৃক্ষ।

ট- মহাত্মা আনন্দ কিশোরের চতুষ্পাঠীর রোয়াক।

ঠ—শ্রীশ্রী৺শ্যামসুন্দর জীউর অঙ্গরাগ গৃহের রোয়াক।

ড- শ্রীমতী দুর্গামণি দেবী প্রতিষ্ঠিত ৺শ্যামসুন্দরের সেবাকার্যে উৎসৃষ্ট ইন্দারা।

ঢ—ভোগ মন্দিরের পৈঠা।

ণ—৺কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামীর রন্ধনশালা।

ত—ঐ রন্ধনশালা।

থ—প্রভুপাদের ভোজনাগার।

দ—ঐ রন্ধনশালা।

ধ—প্রভুপাদের শয়নকক্ষ।

ন—৺শ্যামসুন্দরজীর বর্ত্তমান ভোগ মন্দির।

প, ফ—৺শ্যামসুন্দরের বর্ত্তমান ভাণ্ডার ঘর।

ব, ভ—৺ব্রজের চাদ গোস্বামীর নব গৃহ।

ম—প্রভুপাদের রোপিত কাঁঠাল গাছ।

য— সদর ফটক।

র—শ্রীমন্দিরের প্রবেশ-পথ।

ল—তুলসী মন্দির।

শ—খিড়কীর দ্বার।

Girish Printing Works.

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীগুরুদেব প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের একখানি জীবন-চরিত আমাকে লিখিতে আমার অধিকাংশ গুরুভ্রাতা ও অন্যান্য বন্ধুবর্গ অনুরোধ করেন। নানা কারণে আমি এতদিন এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হই নাই। পরিশেষে বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে প্রলুব্ধ হওয়ার মতন, আমি এই কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীযুক্ত সীতানাথ গোস্বামী মহাশয়কে আমার সাহায্যার্থ শান্তিপুরের প্রত্যক্ষদর্শী বৃদ্ধদিগের নিকট হইতে গুরুদেবের বাল্যজীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি। তদনুসারে তিনি আগ্রহ সহকারে শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের বাল্যসহচর ও সমসাময়িক গণ্যমান্য বৃদ্ধ-ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অনেকগুলি ঘটনা সংগ্রহ করিয়া আমাকে দেখাইলে, তাঁহার সংগৃহীত ঘটলাগুলিই স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে "বালক বিজয়কৃষ্ণ" নাম দিয়া প্রকাশিত করিতে আমি অনুরোধ্ করি। আমাদের অন্যান্য অনেক গুরুভ্রাতাও এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। আজ "বালক বিজয়কৃষ্ণ" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল দেখিয়া আমাদের আনন্দের সীমা নাই। গ্রন্থকার শ্রীশ্রীগুরুদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র, গোস্বামিবংশে ইনিই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়; সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এই পুস্তক প্রচার করিয়া লেখক আপনার একটা বিশেষ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা এই সংগ্রহকার্য্যটী এরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত কি না সন্দেহ।

গোস্বামী মহাশয়ের জীবনের সহিত বঙ্গদেশের অর্দ্ধশতাব্দীর ধর্ম্মনীতি ও সমাজের অতিশয় ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ। প্রাচীন ও নবীন ভাবের সহিত তাঁহার যেরূপ সম্পর্ক, বাঙ্গালাদেশের আর কোনও সুবিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গেই

প্রাচীন ও নবীনের সেরূপ ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ নাই। উভয়-ভাবের বিচিত্র-মিলনে তাঁহার জীবনে যে "যুগধর্ম্ম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত পঞ্চ পুষ্পের স্তবক নহে, উহা চির-পুরাতনের মধ্যে নবীনের অভিব্যক্তি মাত্র, একটী দৃষ্টান্তদ্বারা আমার বক্তব্যকে কথঞ্চিৎ পরিস্ফুট করার চেষ্টা করিব।

বার্ত্তিককার, পাণিনির অসম্পূর্ণতা দেখাইলেন, লোকেরা তাহাই মানিয়া লইয়া পাণিনিকে অপূর্ণ-ব্যাকরণ মনে করিতে লাগিল; কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলি মহা-ভাষ্য রচনা করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, বার্ত্তিক কার, পাণিনির যে সকল অপূর্ণতা দেখাইয়াছেন, পাণিনি তাঁহার সূত্রমধ্যেই গূঢ়-ভাবে সেই সকল অভাব পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, কোথাও অসম্পূর্ণতা নাই। পতঞ্জলি যদি স্পষ্ট করিয়া না দেখাইতেন, তবে সাধারণ পাঠকগণ সেই নিগূঢ়-তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেন না। গোস্বামী মহাশয়ও পতঞ্জলির ন্যায় দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীনের বিরুদ্ধে নব্য সমাজের মনে যে সকল সংশয় ও আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, প্রাচীনের মধ্যেই তাহা মীমাংসিত হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীন ও নবীনকে যিনি তন্ন তন্ন করিয়া জানেন নাই, তাঁহার পক্ষে এই সংশয় বিদূরিত করা অসাধ্য এবং সেই জন্যই গোস্বামী মহাশয়কে উভয় প্রকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইয়াছিল। এই নিগূঢ়-তত্ত্ব, এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় অধিকতর স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আশা করি, অভিজ্ঞ পাঠক ইঙ্গিতেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেব ধর্ম্মের পাঁচটী স্তরের বর্ণনা করিয়াছেন। সেই পাঁচটীর নাম,—নীতি, ধর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ এবং লীলা। তিনি আপনার জীবনে এই পঞ্চ স্তরের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন।

নীতি না থাকিলে ধর্ম্মই হইল না, কিন্তু নীতি থাকিলেই যে ধর্ম্ম হইল, এইরূপ নহে। নীতি, ধর্ম্মের আদিস্তর, এই নীতির উপরই

অন্যান্য স্তর প্রতিষ্ঠিত। গোস্বামী মহাশয় বাল্যকালেই এই আদি-স্তরের উপর কিরূপ দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, "বালক বিজয়কৃষ্ণ" পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকা তাহার পরিচয় পাইবেন। গোস্বামী মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত জানিতে যাঁহারা অভিলাষী, এই গ্রন্থ তাঁহাদের অবশ্যপাঠ্য। এই গ্রন্থ রচনা করিয়া লেখক মহাশয় মনুষ্য-সমাজের পরম কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

সূচীপত্র।



বালক বিজয়কৃষ্ণ।

বংশ-পরিচয়।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী শান্তিপুর বঙ্গদেশে বিশেষরূপে বিখ্যাত। অতি পূর্ব্বে ইহা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, ভক্তাবতার শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের সময় হইতে এই স্থান বঙ্গবিশ্রুত হয়। শান্তিপুরের বর্ত্তমান গোস্বামিগণ এই মহাপুরুষের বংশসম্ভূত। পূর্ব্বে ইঁহাদের বাসস্থান শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউর উপত্যকায় নবগ্রামনামক গণ্ডগ্রামে ছিল। বর্ত্তমানে ঐ নবগ্রাম জনশূন্য অরণ্যময়। উহা সুনামগঞ্জ মহকুমা হইতে সার্দ্ধ ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। পাঠানবিধ্বংসী গৌড়বিজয়ী রাজা গণেশের* সুপ্রসিদ্ধ প্রধান-মন্ত্রী নৃসিংহ মিশ্রই প্রথম শান্তিপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

নৃসিংহ মিশ্রের অপর নাম নরসিংহ নাড়িয়াল। ইনি ভারতবিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্যের পৌত্র ও সায়নাচার্য্যের পুত্র এবং আরু

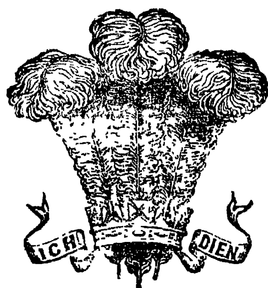
* রাজা গণেশের প্রকৃত নাম "কংসনারায়ণ"। "কংস" মুসলমান ও ইংরেজ ঐতিহাসিকের হাতে পড়িয়া "কানিশ" "গানিশ" ও অবশেষে "গণেশে" পরিণত হইয়াছে। ইঁহার রাজত্বকাল ১৩৮৫ হইতে ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা। ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যা, ১৪৬ পৃঃ।

ওঝার বংশজাত বলিয়া খ্যাত। শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পিতা কুবের আচার্য্য নরসিংহ নাড়িয়ালের প্রপৌত্র। নৃসিংহ মিশ্রের পুত্র বিদ্যাধর মিশ্র, তৎপুত্র ষট্‌কড়ি (ছয় কড়ি) মিশ্র, তৎপুত্র পণ্ডিতাচার্য্য কুবের চন্দ্র মিশ্র। এই কুবেরাচার্য্যের ঔরসে নাভা দেবীর গর্ভে সাক্ষাৎ * ঈশ্বরাবতার শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ মিশ্র। ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়া অদ্বৈত এবং আচার্য্য পদে বরিত বলিয়া আচার্য্য নামে খ্যাত হন। তাঁহার জন্মসময়ে দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। তখন সমাজবিধ্বংসী বিকৃত তান্ত্রিক-ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ মদ্য, মাংস, জীবহিংসা বঙ্গসমাজকে ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করিতেছিল। সেই সময়ে † মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীশ্রীঅদ্বৈত গোস্বামী প্রভু দেশের দুর্দ্দশামোচনের জন্য অবতীর্ণ হইয়া নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞের উদ্বোধনে দেশকে পবিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবজাত ভক্তিবায়ুর স্নিগ্ধ হিল্লোলে সমগ্র ভারতভূমি নবজীবন লাভ করিয়াছিল, এবং তিনি ঐকান্তিক তপস্যা ও গভীর হুঙ্কারের আকর্ষণে সাঙ্গোপাঙ্গ প্রেমাবতার ‡ শ্রীগৌরাঙ্গকে আবির্ভূত করাইয়া প্রেমভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসময়ী বন্যায় সমগ্র ভারতভূমিকে প্লাবিত করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতাচার্য্যের তিরোধানের পর তদীয় বংশধরেরা একত্র অবস্থানের অসুবিধানিবন্ধন শান্তিপুরের বিভিন্নস্থানে আপন আপন সুবিধামত বাস করিতে লাগিলেন। আচার্য্যপৌত্র দেবকীনন্দন গোস্বামী প্রভু

অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞী সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগতাদি কার্য্য।
তাঁহার অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈতাচার্য্য॥
যাঁহার তুলসীদলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যেরে অবতারে॥

বৰ্ত্তমান আতাবুনিয়া গোস্বামিবাটীর স্থাপয়িতা। সেই সময় তিনি যে স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন, সেই স্থান আতাবৃক্ষের প্রাচুর্য্যহেতু জঙ্গলময় থাকায়, ঐ বাটী আতাবুনিয়া গোস্বামিবাটী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অদ্যাপি সেই সকল বৃক্ষের দুই চারিটী বংশধর থাকিয়া উক্ত নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। এই বাটীর বিগ্রহ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ অদ্বৈতাচার্য্যের সময়ে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই গোস্বামি বংশে অদ্বৈতাচার্য্যের অধস্তন দশম পুরুষে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।





পিতা।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পিতা প্রভুপাদ আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় গভীর পাণ্ডিত্য, অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান, প্রবল ধর্ম্মানুরাগপ্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীদ্বারা গোস্বামিবংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ভক্তিশাস্ত্রে ইহাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য পরিলক্ষিত হইত। শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত তৎকালে অতি বিবল ছিল। এই শাস্ত্রপাঠকালে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়া দেহে অশ্রু, কম্প, স্বেদপুলক প্রভৃতি অষ্ট সাত্বিক বিকার প্রকাশ পাইত ও প্রতি লোমকূপ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্তোদ্গম হইয়া উত্তরীয় বসন সিক্ত করিত এবং তৎকালে শ্বাস-প্রশ্বাস এরূপভাবে প্রবাহিত হইত যে, তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও শিষ্যবর্গমধ্যে যাঁহারা উপস্থিত থাকিতেন, সকলেই তাঁহার জীবনাশশঙ্কায় ভীত হইতেন।

গোস্বামী মহাশয় এরূপ সরল ও মধুরভাবে শাস্ত্রাদির আলোচনা করিতেন যে, তাহা একবার শুনিলে কেহ আর ভুলিত না। এইরূপে অনেক অশিক্ষিত লোকও তাঁহার সহবাসে থাকিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিল। কথিত আছে,—মহাত্মা আনন্দকিশোর একদা স্বীয় অধ্যাপক* গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুরোধে নাটোরের রাজবাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত

* গোস্বামী ভট্টাচার্য্যঃ—ইনি শ্রীমান্ রাধানাথ গোস্বামী বিদ্যাবাচস্পতি নামে খ্যাত। ইনি অষ্টাবিংশতি স্মৃতির টীকা করেন। অদ্যাপি সেই টীকা বঙ্গদেশে পঠিত হইতেছে। নাটোরের রাজপরিবার ইহাঁরই মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পরে

পাঠ উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের নাটোরে অবস্থান কালীন সভাসদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে শ্রবণা দ্বাদশীর বিচার আরম্ভ হয়। বিচার ক্রমে বিতণ্ডায় পরিণত হওয়ায় উক্ত বিষয়ের মীমাংসাভার গোস্বামী মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হয়। যখন পণ্ডিতমণ্ডলী তর্কজাল বিস্তার করিয়া পরস্পর কোলাহলে প্রবৃত্ত, সেই সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের পরিচারক মাধব দাস উক্ত সভায় উপস্থিত ছিল। সে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া অতি বিনীতভাবে পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ঠাকুর মহাশয়গণ, আপনারা বিবাদ করিবেন না; এ বিষয়ে আমাদিগের কর্ত্তাঠাকুর এইরূপ মীমাংসা করিয়া থাকেন।" পরিচারকের কথায় পণ্ডিতমণ্ডলী বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সভাসদ্বর্গ ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন; বিনয়মুগ্ধ পণ্ডিতবর্গমধ্যে কেহই অসন্তুষ্ট হইলেন না। অল্পক্ষণ পরে গোস্বামী মহাশয় সভামধ্যে আগমন করিয়া যখন ঐ বিষয় মীমাংসা করিয়া দিলেন, তখন সকলে দেখিলেন যে, ঐ পরিচারকের উক্তির সহিত গোস্বামী মহাশয়ের মীমাংসা অভেদ হইল। এই সময়ে নাটোরের মহারাজ বাহাদুর সভাস্থলে সমাসীন ছিলেন। তিনি পরিচারকের জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, সভামধ্যেই স্বীয় গাত্রবস্ত্র (শাল) উন্মোচন করিয়া ঐ পরিচারককে প্রদান করিলেন। †

সংসারের যাবতীয় ভোগবিলাসবর্জ্জিত, পরসেবা-নিরত আনন্দকিশোর কখনও কাহারও নিকট প্রার্থনা করিতেন না। তাঁহাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে যাহা প্রদান করিত, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতেন। তাঁহার

ইহাঁর সমকক্ষ পণ্ডিত আর শান্তিপুরে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। প্রভুপাদ আনন্দকিশোর ইহাঁরই ছাত্র ছিলেন।

† গোস্বামী মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতা স্বর্গীয় পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামীর নিকট শ্রুত।

অর্থের অধিকাংশই পরসেবায় ব্যয়িত হইত। তিনি কখন কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিতেন না; ধূলিমুষ্টি ও অর্থমুষ্টি উভয়ের মধ্যে তাঁহার নিকট অধিক ইতর-বিশেষ ছিলনা। দীন-দুঃখী, অন্ধ-আতুর, দায়গ্রস্ত প্রভৃতি বিপন্নজনদিগকে সাধ্যানুসারে বিপন্মুক্ত করিতেন। তাঁহার ঈদৃশী সহৃদয়তা ও অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠাপ্রভৃতি গুণগ্রাম আপামর-সাধারণের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তির কারণ হইয়াছিল। বহু ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া জীবনকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছিল। তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন; জীবনে কেহই তাঁহাকে একটীও নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনেন নাই।

আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের অসাধারণ শৌচাচার তাঁহার লোকপ্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল। ইহাঁর গমনাগমনের পথ নিয়ত গোময়দ্বারা পরিলিপ্ত থাকিত। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া, গঙ্গাস্নানানন্তর তিনি সমস্ত দিন পূজা অর্চ্চনাদিতে অতিবাহিত করিতেন, এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে জননীর চরণামৃত পান করিয়া স্বপাকে আহার করিতেন। প্রতিবার শৌচান্তে স্নান না করিয়া তিনি গৃহে প্রবেশ করিতেন না; এমন কি রন্ধনের কাষ্ঠগুলি পর্য্যন্তও জলে ধৌত না করিয়া পাক করিতেন না। এই কারণে তিনি দেশে ও রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূমপ্রভৃতি জিলার শিষ্যালয়ে "খড়ি ধোয়া" গোস্বামী নামে পরিচিত ছিলেন এবং এখনও তাঁহার বংশধরেরা ঐ সকল স্থানে গমন করিলে "খড়ি ধোয়া" গোঁসায়ের বংশধর নামে অভিহিত হন। "দামোদর" নামে শালগ্রাম শিলা সর্ব্বদা তাঁহার কণ্ঠে আভরণরূপে শোভা পাইতেন। অদ্যাপি সেই শালগ্রাম শিলা ৺শ্যামসুন্দরের শ্রীমন্দিরে রক্ষিত হইয়া নিয়মিতরূপে পূজাদি প্রাপ্ত হইতেছেন।

সাংসারিক কোন দুর্ঘটনা তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিত না। তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর কঠিন পীড়াতে ৺বিগ্রহের শ্রীচরণামৃতই

ঔষধাপেক্ষা তিনি অধিক বিশ্বাসের বস্তু মনে করিয়া সেবন করাইতেন। শ্রীচরণামৃতকে ইনি পরম ধন বিবেচনা করিতেন। একদা আনন্দকিশোর পূজায় বসিয়াছেন, এমন সময়ে পুত্রবধূর আসন্নকাল সমুপস্থিত দেখিয়া তাঁহার মাতা জানকী দেবী পুত্রকে এই শোকসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া কোন উত্তর পাইলেন না; তিনি তখন সমস্ত আপদ্ বিপদ্ বিস্মৃত হইয়া ভাবরাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট। জগতের ক্ষুদ্র ঝটিকা তাঁহার মহান্ হৃদয়ের অচল-চূড়া বিকম্পিত করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। পরে স্ত্রীকে শ্রীচরণামৃত পান করাইতে আসিয়া দেখিলেন. তাঁহার আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন দুঃখিত চিত্তে বলিলেন, "হা হতভাগিনি! আজ শ্রীচরণামৃতপানের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলে!" বিপদে যাঁহার বিশ্বাসে একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ নাই, তাঁহার বিশ্বাসই বা কত গভীর, কত মধুর!

প্রভুপাদ আনন্দকিশোরের দর্শনলালসায় কি হিন্দু কি মুসলমান, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলেই সমভাবে ব্যাকুল হইত; তিনি যখন যে স্থানে গমন করিতেন তথায় তাঁহার আগমনবার্ত্তা শতমুখে প্রচারিত হইয়া পড়িত। তাঁহার চরণধূলিগ্রহণ আশায় তাঁহার পাদোদক পানের নিমিত্ত অত্যন্ত জনতা হইত। একবার গোস্বামী মহাশয় বগুড়া জেলার কোন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাঁহার শিষ্যালয়ে যাইতেছেন, পথ লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে, কেহ ষাষ্টাঙ্গ দিতেছে, কেহবা চরণামৃত পান করিতেছে। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে ঐ জেলার কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারিসহ ঐ পথ অতিক্রম করিতেছিলেন; তিনি জনমণ্ডলীর এবম্প্রকার ভক্তিভাবদর্শনে মুগ্ধ হইয়া কর্ম্মচারীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ম্মচারী সাহেবের নিকট গোস্বামী মহাশয়ের প্রভাব বর্ণনা করিয়া তদনন্তর তাঁহার চরণামৃত পান করিলেন। এই সকল দর্শন করিয়া উক্ত ইংরাজপুঙ্গব

এতদূর চমৎকৃত হয়েন যে, তখনই গোস্বামী মহাশয়ের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে পুরীধামে ৺জগন্নাথ দর্শনে গমন করিয়াছিলেম। মৃত্তিকার ঘর্ষণে তাঁহার বক্ষে ক্ষত হইয়াছিল; এইরূপ কঠোর ক্লেশসহকারে ৺জগন্নাথ দর্শনের পর, তাঁহার এই ক্ষণজন্মা সন্তান "বিজয়কৃষ্ণের" জন্ম হয়।

আনন্দকিশোর কুলদেবতা ৺শ্যামসুন্দর জীউর প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ও অচলাভক্তিপ্রযুক্ত প্রতিদিন স্বহস্তে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিতেন এবং সাধু ও বৈষ্ণবসেবা তাঁহার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের অঙ্গীভূত ছিল। প্রতিদিন উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের আহার করাইতেন। রামদাস, কৃষ্ণদাস, মাধবদাসপ্রভৃতি কয়েকজন বিষয়বিরক্ত বৈষ্ণবদ্বারা তিনি সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকিতেন; ইহাঁদের সেবা না হইলে কদাচ জলগ্রহণ করিতেন না। বৈষ্ণবসেবানন্তর প্রভুপাদ আনন্দকিশোর পথিমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অভুক্ত আর কেহ আছেন কি না সংবাদ লইয়া তৎপরে ভোজনে বসিতেন।

অনেক সময়ে এই মহাপুরুষের যোগৈশ্বর্য্য স্বঃতই প্রকাশিত হইয়া পড়িত। কয়েকবার অতি অল্পমাত্র প্রসাদদ্বারা ইনি বহু ব্যক্তিকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন; তথাপি অন্ন ব্যঞ্জনাদি উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। তাঁহার এই সকল অমানুষিক কার্য্য দেখিলে ভাণ্ডারে সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া মনে হইত। রঙ্গপুর, ময়মনসিংহপ্রভৃতি স্থানে তাঁহার এই ঐশ্বর্য্য একাধিকবার প্রকাশিত হইয়াছিল। একবার ময়মনসিংহ জিলার অন্তঃপাতী সলিয়া গ্রামে শিষ্য দামো ঘোষের বাটীতে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর পারণের দিবস ঐ গ্রামস্থ প্রায় শতাধিক শিষ্য গোস্বামী

মহাশয়ের প্রসাদ গ্রহণজন্য উপস্থিত হন। গৃহস্বামীকে পুনরায় রন্ধন করিবার আয়োজন করিতে দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে আহ্বান করিয়া উক্ত কার্য্যে বিরত হইতে আদেশ করেন এবং আরও বলেন যে, প্রভুর ইচ্ছায় এই প্রসাদদ্বারাই সঙ্কুলান হইবে। এই অসম্ভব বাক্যে শিষ্যের প্রত্যয় হইল না। সে মনে করিল, এই অল্পমাত্র আহারীয় দ্রব্যে সমাগত ব্যক্তিগণকে "করপ্রসাদ"* প্রদান করিতেই কুলাইবে না; ইহা দ্বারা গোস্বামী মহাশয় কিরূপে এতগুলিকে পরিতুষ্ট করিবেন। এমন সময়ে সমাগত ব্যক্তিগণকে আহারে বসিবার জন্য আহ্বান করিতে দেখিয়া শিষ্য দামো ঘোষ গললগ্নীকৃতবাসে গোস্বামী মহাশয়কে বলিল, "প্রভো! এতগুলি স্বজাতির নিকট আমাকে লজ্জিত করিবেন না।" গোস্বামী মহাশয় তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, "তোমার কোন চিন্তা নাই; দয়াময়ের ইচ্ছায় সব কুলাইয়া যাইবে।" অবোধ শিষ্য তথাপি বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; ভয়ে ও উদ্বেগে তাঁহার বুক দুরদুর করিয়া কাঁপিতেছিল; আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুক্ষণ মধ্যেই তাহার ভ্রম অপনীত হইল; সে বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে, সেই অল্পমাত্র প্রসাদদ্বারা এতগুলি লোকের সঙ্কুলান হইয়াও অন্ন-ব্যঞ্জনাদি উদ্বৃত্ত রহিল; তখন শিষ্য তাঁহার অবিশ্বাসের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হইল এবং গোস্বামী মহাশয়ের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল। আজ ভক্তের দিঙ্‌নিনাদী যশঃ প্রচার করিবার জন্য, অবিশ্বাসী জগৎকে আশ্বস্ত করিবার জন্য প্রভু তাঁহার ভক্তমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিলেন। ভক্তপ্রিয় ভক্তের লজ্জা কোন্ প্রাণে সহ্য করিবেন? ভক্তের সখা চিরদিনই এইরূপে ভক্তের মান রক্ষা করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি, পাণ্ডবসখা দুর্ব্বাসার কোপ হইতে এইরূপেই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন; সভামধ্যে বস্ত্র-বৃদ্ধি

* "করপ্রসাদ":—হাতে হাতে প্রদত্ত হয় বলিয়া ইহাকে "করপ্রসাদ" বলে।

করিয়া এইরূপেই দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন; সহস্র ছিদ্রযুক্ত কলসে জল আনাইয়া এইরূপেই প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ক্ষালন করিয়াছিলেন। ধন্য ভক্ত, ভক্তবৎসল তোমাদের জন্য যুগে যুগে এইরূপই করিয়া থাকেন!

আর একবার ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কলাবাধা গ্রামে দোল পূর্ণিমার দিবস তাঁহার কোন শিষ্য ৺বিগ্রহকে আবির দিবার জন্য যত্ন পূর্ব্বক কিছু আবির সংগ্রহ করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আনিয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় তখন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। শিষ্য আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সম্মুখে আবিরটুকু রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। ভাবাবেশে গোস্বামী মহাশয় সমুদয় আবিরটুকু শ্রীমদ্ভাগবতের উপর ঢালিয়া দিলেন; ইহা দেখিয়া শিষ্য দুঃখিত চিত্তে ভাবিতে লাগিল, অধমের আবির প্রভু ঠাকুরকে দিলেন না। অন্তর্যামী গোস্বামী মহাশয় শিষ্যের মনোভাব জানিতে পারিয়া মধুরবাক্যে শিষ্যকে ৺ বিগ্রহ দর্শনের জন্য শ্রীমন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইতে বলিলেন। শিষ্য মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহারই প্রদত্ত আবিরে ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গ মাথামাথি হইয়া গিয়াছে। তখন সে নিজের ভ্রমজন্য অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল এবং সেই দিন হইতেই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে ভক্ত, ভাগবত ও ভগবান তিনই এক—একই তিন।

প্রভুপাদ আনন্দকিশোর তিনবার দার পরিগ্রহ করেন। দুইবার নিঃসন্তান বিপত্নীক হওয়ায় অনেক দিন পর্য্যন্ত দার পরিগ্রহ করেন নাই; অবশেষে তীরস্থ জ্যেষ্ঠভ্রাতা গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয়ের অন্তিম-অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া প্রায় ৫০ বৎসর বয়সে তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। ইহাঁর তৃতীয়া পত্নী দেবী স্বর্ণময়ীর গর্ভে ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণের জন্ম হয়।

গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয়ের মৃত্যু সমধিক বিস্ময়জনক। মৃত্যুর পূর্ব্বদিবস গোস্বামী মহাশয়ের শরীর সামান্য অসুস্থ হওয়ায়, সেই দিবস অন্নাহার করিলেন না; পর দিবস আহারের আয়োজন হইয়াছে, ভোজনে বসিবেন, এমন সময় কবিরাজ গৌরসেন মহাশয় গৃহে উপনীত হইলেন। গোস্বামী মহাশয় হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলে কবিরাজ নাড়ী পরীক্ষা করিয়া গৃহস্থ ব্যক্তিবর্গকে বলিলেন, "নাড়ীর অবস্থা মন্দ, তীরস্থ করিবার আয়োজন করুন।" পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ প্রথমে পরিহাস বিবেচনা করিল; পরক্ষণে সত্যতা অনুভব করিয়া সকলেই ভীত ও বিষণ্ণ হইল। শ্রীসংকীর্ত্তন সম্প্রদায় আসিল, লোকজন সমবেত হইল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই গঙ্গাযাত্রার সমুদয় আয়োজন হইয়া গেল। প্রভুপাদ গোপীমাধব দুই হস্তে দুইটী শশা লইয়া ভক্ষণ করিতে করিতে খট্টারোহণে গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। গোস্বামী মহাশয়কে বহন করিয়া খট্টাবাহকগণ ক্রমে কৃষ্ণময় মোদকের দোকান সম্মুখে উপনীত হইলে তিনি তথায় অবতরণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বাহকেরা গোস্বামী মহাশয়কে নামাইলে তিনি ঐ দোকান হইতে রসগোল্লা লইয়া ভোজনে বসিলেন। রঙ্গ দেখিয়া সকলে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল; গোস্বামী মহাশয় বিবাহ সভায় যাইতেছেন বলিয়া কেহ কেহ উপহাস করিতেও ছাড়িল না। অনন্তর বাহকেরা গোস্বামী মহাশয়কে গঙ্গাতীরে লইয়া গেল। শুনিয়াছি এইস্থানে আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের দিব্য দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি কনিষ্ঠ আনন্দকিশোরকে ডাকাইয়া বলিলেন, আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি, তোমার দুইটী পুত্র-সন্তান হইবে; সুতরাং তোমাকে পুনরায় বিবাহ করিতেই হইবে এবং সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে কনিষ্ঠটীকে আমার পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিও।

প্রভুপাদ আনন্দকিশোর ১২৫১ সনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ উপলক্ষে রঙ্গপুর

জিলার অন্তঃপাতী আমলাগাছী গ্রামে জমিদার শিষ্য ৺ মুকুন্দনারায়ণ চৌধুরীর বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। তথায় পাঠ করিতে করিতে ভাবাবেশে অচৈতন্য হন। তদবস্থায় গোপীনাথপুরের খামার বাড়ীতে তাঁহাকে আনয়ন করা হইলে সত্যযুগাদ্যা অক্ষয় তৃতীয়ার দিবসে তিনি সমাধিযোগে নিত্যধামে গমন করেন। অদ্যাপি শান্তিপুরে তিনি "ঋষি গোস্বামী" নামে খ্যাত আছেন।





মাতা।

বিজয়কৃষ্ণের জননী স্বর্গীয়া স্বর্ণময়ী দেবীর চরিত্র এ যুগের একটী অভিনব বস্তু। তিনি সর্ব্বভূতে দয়া, দীন-দুঃখীর প্রতি সমবেদনা, ভগবদ্ভক্তি, আতিথেয়তাপ্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীদ্বারা শান্তিপুরবাসীর হৃদয়ে একটী আদর্শ স্ত্রী-চরিত্রের উজ্জ্বল চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহার গুণগাথা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাঁর নিকট ছোট বড় বিচার ছিল না, তিনি সকলকেই সমান প্রীতির চক্ষে দেখিতেন; দীন-দুঃখীর চক্ষে অশ্রু দেখিলে ইহাঁর অশ্রুরোধ করা কঠিন হইত। অনাথাদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইতে ইনি অত্যন্ত আনন্দানুভব করিতেন। শান্তিপুরে "মতিগঞ্জ" নামে স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী ছোট বাজার আছে। এই দয়াবতী নারী তথায় গমন করিয়া যে সকল দুঃখিনী বিধবা শাক সবজী বিক্রয় করিতে আসিত, তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইতেন, তাহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া নিজেও তাহাদের সহিত ক্রন্দন করিতেন এবং যাহার যাহা অভাব, নিজ সাধ্যানুসারে তাহা পূরণ করিতেন। কাহাকেও অর্থ, কাহাকেও বস্ত্র, কাহাকেও তৈজসপত্র দান করিতেন। দানের সময় নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইত। অবস্থা এরূপ স্বচ্ছল ছিল না যে, অবিশ্রান্ত দান চলিতে পারে, সেইজন্য এক এক দিন সমুদয় আহারীয় বস্তু অতিথি সৎকারে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় সংসারের সকলকেই উপবাসী

থাকিতে হইত; এবং দান করার জন্য সময়ে সময়ে গৃহ বস্ত্র ও তৈজস পত্র শূন্য হইয়া পড়িত। তিনি কৃপণদিগকে আহার করাইতে বড়ই ভাল বাসিতেন। বলিতেন, আহা! উহারা মহাপ্রাণীকে কষ্ট দেয়, উহাদেরই ভাল করিয়া আহার করাইতে হয়। আবার কখন কখন কৃপণদিগের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "ওদের নাম কত্তে নেই, ওরা পিঁপড়ের পায়ে বেড়ী দিয়ে রাখে, পাছে রসগোল্লার রস চুরি ক'রে খায়।"

দেবী স্বর্ণময়ী কখনও একার উপযোগী রন্ধন করিতেন না; বলিতেন, যাহারা একার উপযোগী রন্ধন করে, তাহারা শৃগাল কুকুরের সমান। রন্ধনকার্য্যসমাপনান্তে মনুষ্যব্যতীত পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গপ্রভৃতিকে আহার দিতেন; বনমধ্যে পিপীলিকাদিগের জন্য অন্ন ছড়াইয়া দিতেন। তাঁহার ভূতযোনির অস্তিত্বে প্রবল বিশ্বাস থাকায় তাহাদের জন্যও ভূগর্ভে অন্ন প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। এই সমস্ত করিয়া তৎপরে আহার করিতেন। কোন সময়ে ইহাঁর গৃহে রামলাল নামে একটী পরিচারিকার পুত্র প্রতিপালিত হইত। রামলাল জাতিতে তন্তুবায় ছিল। ইনি নিজ পুত্রদের সহিত তাহার কোনরূপ প্রভেদ করিতেন না। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ একদিন জননীর ভালবাসার কথা উল্লেখ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন। "তিনি দাসীপুত্রকে আমাদের সঙ্গে তুল্যরূপ ভালবাসিতেন। একখানা থালা, একটা ঘটি, একটা গ্লাস, একখানা পিঁড়ে তাহাকেও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন; এ বিষয়ে অপরের কথায় তিনি কর্ণপাত করিতেন না। বরং দাসীপুত্র বলিয়া অবজ্ঞা করিলে বেদনা অনুভব করিতেন; বলিতেন, 'আহা! কৃষ্ণের জীব সকলই সমান!'

তিনি কাহারও সহিত দ্রব্যাদি লইয়া দর দস্তর করিতে জানিতেন না। যে যাহা চাহিত, তাহাকে তাহাই প্রদান করিতেন। একবার শান্তিপুরে এক কাষ্ঠবিক্রেতার সহিত বিজয়কৃষ্ণ কাঠ লইয়া দর

করিতেছিলেন। কাষ্ঠবিক্রেতা একদর, এবং গোস্বামী মহাশয় অন্য দর বলিতেছিলেন। তাঁহার সহিত দরে বনিতেছে না দেখিয়া কাষ্ঠ-বিক্রেতা বলিল,—"আপনি মা ঠাকুরাণীকে ডাকুন," ইতিমধ্যে মাতা তথায় আসিয়া সমস্ত অবগত হইলেন এবং বলিলেন,—"গরিব লোকের দুই চারি আনা মারিয়া কি তুই বড় লোক হ'বি? উহাদের সহিত গোল করিস্ না, উহারা যা চায় তাই দে; উহারা গরিব লোক, উহাদিগকে কিছু বেশীই দিতে হয়, নতুবা উহাদের স্ত্রীপুত্রেরা কি খাইয়া বাঁচিবে?"

স্বর্ণময়ী দেবী অতি সম্ভ্রান্ত গৃহের দুহিতা ছিলেন। পিতৃকুলের সম্ভ্রমে এবং ভাগবত স্বামীর গৌরবে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেন। সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইত না। মহৎ বংশে জন্ম গ্রহণ করিলে এবং মহতের সহবাসে কালাতিপাত করিলে মনুষ্যের হৃদয়ে মহৎ ভাব স্বভাবতঃ উদিত হইয়া থাকে। একদিন তাঁহার পরিচারিকার পুত্রের সহিত বালক বিজয়কে তিনি এক পংক্তিতে আহারে বসাইয়া দেন, এতদ্দর্শনে পরিচারিকা ভীতা হইয়া কহিল "মা! এ করেছেন কি? গোঁসায়ের ছেলের সহিত এক সঙ্গে খেতে দিয়াছেন, লোকে বলিবে কি!" কথা শুনিয়া জননী স্বর্ণময়ী ক্রোধভরে বলিলেন—"চুপ্ কর্! আমার ছেলেকে মাটী কর্‌বি?"

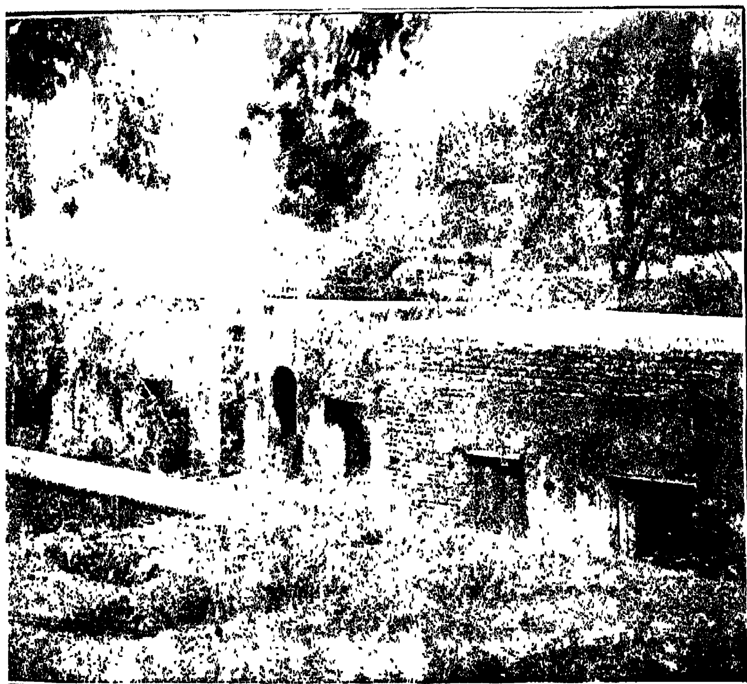
একবার জননী স্বর্ণময়ী তাঁহার পিতার অসুস্থতা সংবাদ অবগত হইয়া শান্তিপুর হইতে পিতৃগৃহে উপনীত হইয়াছিলেন। গ্রাম্য প্রথানুসারে প্রতিবেশিগণ স্বর্ণময়ীকে দেখিবার জন্য তাঁহাদের গৃহে সমবেত হইতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি অবগত হইলেন যে, তাঁহাদের গ্রামনিবাসী শ্রীযুত রামচন্দ্র ভাদুড়ী মারা গিয়াছেন; পূর্ব্বেই তাঁহাদের সংসার অস্বচ্ছল ছিল; এক্ষণে তাঁহাদের সংসারে একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু

হওয়ায় এই অনাথ পরিবারবর্গকে বড়ই ক্লেশে কালযাপন করিতে হইতেছে; অধিকন্তু তুইটী দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান দুগ্ধ-অভাবে মৃতপ্রায় হইয়াছে; এ সংবাদে তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি এই বিপন্ন পরিবারের ক্লেশনিবারণার্থ মাসিক তুই টাকা করিয়া সাহায্য দান করিতে স্বীকার করিলেন। ঘটনাক্রমে পরিশেষে উক্ত রামচন্দ্র ভাতুড়ীর জ্যেষ্ঠা কন্যা যোগমায়া দেবীর সহিত বিজয় কৃষ্ণ পরিণয় সূত্রে গ্রথিত হন। বিবাহের পূর্ব্বপর্য্যন্ত জননী স্বর্ণময়ী নিয়মিতরূপে তাঁহার প্রতিশ্রুত সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। পরে বিবাহান্তে উক্ত বিপন্ন পরিবার গোস্বামী মহাশয়ের সংসারে আশ্রয় লাভ করেন।

তিনি একবার নৌকাযোগে গঙ্গাসাগর গমন করেন। তথায় দান করিতে করিতে সমুদয় অর্থ নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় মাঝিকে নৌকার ভাড়া প্রদান করিতে পারেন নাই; অগত্যা তিনি তাহাকে সমুদয় দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া রিক্ত হস্তে বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। তিনি ৺পুরীধামে গমন করিয়া বহু অর্থ দান করেন; এই অত্যধিক দানে তাঁহার অনেক টাকা ঋণ হইয়াছিল; পরে গোস্বামী মহাশয় ঐ টাকা পরিশোধ করেন।

তাঁহার ভাসুরপুত্র শ্রীমান্ হরিমোহনের জন্ম হইলে সমাগত ধোপা, নাপিত, বাদ্যকরপ্রভৃতিকে দান করিতে করিতে গৃহের সমুদয় ঘটি, বাটী ও বস্ত্রাদি নিঃশেষ হইয়া যায়; পরে বাজার হইতে পুনরায় ঘটি, বাটী ও বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। বাজার হইতে আম কাঁঠাল ক্রয় করিয়া রাস্তায় দরিদ্র ব্যক্তিগণকে দান করিতেন। তাঁহার পয়সা অনাদায় থাকিবে না জানিয়া কেহ তাঁহাকে ধার দিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইত না। তাঁহার মৃত্যুর পর গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুর আগমন করিয়া তাঁহার দোকানের ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

একবার একজন বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করিয়াছিল।



প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাসভবনের ভগ্নাবশেষ

...ush Printing Work

তাঁহার নিকট বস্ত্র না থাকায়, স্বয়ং ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহাকে নিজ পরিধেয় বস্ত্র দান করিয়াছিলেন। একবার একটী দরিদ্র বালককে শীতে কষ্ট পাইতে দেখিয়া তাহাকে নিজ গাত্রবস্ত্র প্রদান করিয়া নিজে শীতে ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন।

• একদা ভীষণ অগ্নিদাহে শান্তিপুরের কোন বারাঙ্গনার যথাসর্ব্বস্ব দগ্ধ হইয়া যায়। ঐ বারাঙ্গনার দুঃখ দেখিয়া পরদুঃখসন্তপ্তহৃদয়া স্বর্ণময়ী কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনই তিনি নিজ বাটীতে এই বারাঙ্গনাকে স্থান প্রদান করিলেন। সমাজপরিত্যক্তা হীনকার্য্যে আসক্তা কুলটার দুঃখে যাঁহার হৃদয় এতদূর ব্যথিত হয়, তাঁহার হৃদয় কি উপাদানে গঠিত তাহা সহজেই অনুমেয়।

তাঁহার ভগবদ্ভক্তি অতীব বলবতী ছিল। শিবপূজায় ইহাঁর গভীর অনুরাগ দেখা যাইত। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে শিবপূজা করিতেন। ৺কাশীধামে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরকে স্বর্ণচম্পক প্রদান করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিতদিগের ন্যায় বহু পূজার্চ্চনাদির মন্ত্র ও পদ্ধতি জানিতেন এবং বহু স্তবস্তুতি অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

দেবী স্বর্ণময়ী পুত্রদ্বয়ের নিকট হইতে দূরে অবস্থানকালে তাহাদের কোন বিপদ্ ঘটিলে তখনই উপলব্ধি করিতে পারিতেন। পুত্রেরা উপস্থিত হইলে যখন প্রতিঘটনা অবিকল বিবৃত করিতেন, তখন সকলের বিস্ময়ের অবধি থাকিত না। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার জননীর কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলিয়াছিলেন—"আমি বিদেশে যদি কোন আঘাত পাইতাম, রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হইতাম, অথবা কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়িয়া সভয়চিত্তে মাকে ডাকিতাম, বাটী আসিবামাত্র মাতাঠাকুরাণী এক এক দিনের ঘটনা আশ্চর্য্যরূপে উল্লেখ করিতেন। গয়ার পাহাড়ে একদিন পাথরে পা ঠেকিয়া আমার এরূপ আঘাত লাগিয়াছিল যে, 'মা গো' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলাম। পরে বাটী আসিলে মা বলিলেন, 'তুই কি

খুব আঘাত পেয়েছিলি? পায়ে পাথর ঠেকৃলে যেমন আঘাত লাগে, হঠাৎ একদিন আমার তেমনি হ'ল; আমি ভাবিলাম, ঘরে বসে আছি, পাথর কোথায়? তখন তোর ডাক আমার কাণে বাজ্‌ল; মনে হ'ল, তুই কষ্ট পেয়েছিস্'।" তিনি এইরূপ বহু ঘটনার উল্লেখ করিতেন।

তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি অতীব প্রবল ছিল; অপরের মনের কথা তিনি অবগত হইতে পারিতেন; ইন্দ্রিয়াতীত অনেক ঘটনা তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইত; পরলোকগত আত্মা এবং দেবদেবীকে তিনি প্রত্যক্ষ করিতেন; গোস্বামী মহাশয় যে ৺পুরুষোত্তম ধামে অপ্রকট হইবেন, ইহা তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিল; সেই জন্য তিনি তাঁহাকে পুরী যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় মাতৃভক্ত মহাপ্রাণ গোস্বামী মহাশয় ৺পুরীধামে গমন করেন নাই। তাঁহার জনৈক আত্মীয়া বলেন, "আমরা তখন কলিকাতা বাদুড়বাগানের বাসায় থাকিতাম। নানা কারণে অর্থকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় তৎকালে কলিকাতায় বাস করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে একদিন দিদি-মা আমাদের বাসায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—'তোমরা কেন অনর্থক কষ্টভোগ করিতেছ? এই চাবি লইয়া শান্তিপুর গমন কর, তথায় অনায়াসে থাকিতে পারিবে।' একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের মুখে আমাদের সাংসারিক কষ্টের কথা শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম; পরে তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না; কারণ, তখন আমরা পরস্পর সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলাম; অধিকন্তু তিনি ইতিপূর্ব্বে আমাদের বাসা বা উহার ঠিকানা জানিতেন না। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে যেখানে পরিচিত স্থানসম্বন্ধেই ভ্রম হইয়া যায়, সেখানে একজন পুরাঙ্গনার পক্ষে এরূপ ভাবে বাসা নির্ণয় করা ঐশী শক্তির বিকাশব্যতীত কদাচ সম্ভবপর নহে।"

দেবী স্বর্ণময়ীর মনে বিন্দুমাত্র হিংসা ছিল না। শুনিয়াছি, যাঁহার হিংসা

নাই, তিনি জগতে কাহারও নিকট হিংসা প্রাপ্ত হয়েন না। এমন কি সর্প-ব্যাঘ্রপ্রভৃতি হিংস্র জন্তুসকলও তাঁহার বশীভূত হইয়া যায়। স্বর্ণময়ীর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। একবার তিনি বনগ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন অরণ্যমধ্যে ব্যাঘ্রসন্নিধানে শয়ন করিয়াছিলেন। ব্যাঘ্র তাঁহাকে হিংসা করে নাই; অধিকন্তু যতক্ষণ তিনি সেখানে শয়ন করিয়াছিলেন, ততক্ষণ সে অবিচলিতভাবে অবস্থান করিতেছিল। বোধ হয়, তাহার হিংস্র জীবনে সে কখনও এরূপ প্রেমস্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখে নাই। করুণাময়ীর সমাগমে তাহার স্বভাবসুলভ হিংস্র প্রকৃতি বিদূরিত হইয়াছিল। নিম্নে গল্পটী যথাযথ লিখিত হইল :—

জনৈক পরলোকবাসী সিদ্ধ ফকির সময়ে সময়ে স্বর্ণময়ীর দেহে আবিষ্ট হইতেন। ফকিরের আবেশ হইলে তিনি প্রকৃতিস্থ থাকিতেন না; তাঁহার আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া, কলাপ, সমস্তই উন্মত্তবৎ হইয়া যাইত। একবার এই অবস্থায় তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান; গোস্বামী মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কোন সন্ধান পান নাই। অবশেষে কতকগুলি পথিকের নিকট অবগত হইলেন যে, বনগ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে একজন উন্মাদিনী শয়ন করিয়া আছেন। পথিকদিগের কথা শ্রবণ করিয়া গোস্বামী মহাশয় অরণ্যসন্নিধানে আগমন করতঃ মাতাকে তদবস্থায় শয়ান দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জননী গৃহে প্রত্যাবৃত হইলেন।

যাঁহার ক্ষণিক দর্শনে ভীষণ হিংস্র প্রাণীরও সহজাত হিংসা বিদূরিত হয়, সেই পুণ্যশীলা জননীর হৃদয় কত মহান্ এবং তিনি যে শিশুকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন এবং স্তনদুগ্ধের সহিত যাঁহার হৃদয়ে স্বীয় মনের মহাভাব-নিচয় অনুপ্রবিষ্ট করাইয়াছেন, তাঁহার জীবনের গতি কোন্ দিকে ধাবিত হইবে, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। আমরা কালে দেখিতে পাইব, স্বর্ণময়ী যথার্থই স্বর্ণপ্রসূ ছিলেন।

একদা পৌষমাসের সায়ংকালে দেবী স্বর্ণময়ী কালী দর্শন করিবার জন্য তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু গোস্বামী ও জনৈক শিষ্যসহ ৺কালীঘাটে যাইতেছিলেন। যাইবার সময় রাজপথে গ্যাসের নিকটে একজন বারাঙ্গনাকে একখানি পাতলা কাপড় পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পান। পরে কালীদর্শন করিয়া ফিরিবার সময়ও তিনি দেখিতে পাইলেন যে, উক্ত রমণী তদবস্থায় রাজপথে দাঁড়াইয়া দারুণ শীতে কাঁপিতেছে। রমণীর দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তখনই ছুটিয়া গিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বারাঙ্গনাটী দেবী স্বর্ণময়ীর নিরতিশয় দয়া দেখিয়া অকপটে নিজের দুর্দ্দশার কথা প্রকাশ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিল, "মা! কল্যকার আহারের কোনই সংস্থান নাই, তাই দাঁড়াইয়া আছি।" স্নেহের জীবন্ত প্রতিমা দেবী স্বর্ণময়ী রমণীর দুঃখে অভিভূত হইয়া সঙ্গে যাহাকিছু ছিল, সমস্তই দান করিয়া ফেলিলেন এবং সস্নেহে বলিলেন,— "যাও মা! শয়ন কর গে, আর শীতে ক্লেশ ভোগ করিও না।" এদিকে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী পৌত্র দিদিমার নিকট টিকিট ক্রয় করিবার টাকা চাহিলেন। দিদিমা বলিলেন,—"আমি সমস্ত টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া পৌত্র বলিলেন,—"খরচ করিয়া ফেলিলেন! এখন বাড়ী (শান্তিপুর) যাইব কিরূপে!" দেবী স্বর্ণময়ী —"না যেতে পারিস—না যাবি" বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তখন পৌত্র অন্যস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে শান্তিপুর লইয়া আসিলেন।

দেবী স্বর্ণময়ীর হৃদয় আকাশের ন্যায় প্রশস্ত ছিল। ইঁহার নিকট আত্মপরবিচার ছিল না, সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। একবার তিনি শেষ জীবনে ঢাকায় যাইতেছিলেন, সঙ্গে জনৈক ভদ্রলোক যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার পাথেয় না থাকায়, দেবী স্বর্ণময়ী বলিলেন,—"আমার গাঁঠুরী বিক্রয় করিয়া তোমার পাথেয়ের সংস্থান

কর।” ভবিষ্যতে কি হইবে এ চিন্তা একবারও তাঁহার মনে উদিত হইত না। গল্পচ্ছলে প্রায়ই তিনি বলিতেন,—“মানুষের নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই, আগামী কল্য ত দূরের কথা।”

বালক বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার স্নেহশীলা জননীর হৃদয়ের ধন ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হইয়াই পুত্রকে ভালবাসিতেন, এক মূহূর্ত্তের জন্যও বিজয়কে তিনি চোখের আড় করিলে অস্থির হইয়া পড়িতেন। বলিতেন,—“আমি বিজয়কে না দেখিলে পলকে প্রলয় জ্ঞান করি।” বিজয়কৃষ্ণ খেলিতে বাহির হইলে, পাঠশালায় গমন করিলে, ঘাটে স্নান করিয়া আসিতে বিলম্ব হইলে তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। তাঁহার অঞ্চলের নিধি বিজয় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেশান্তরে অবস্থান করিলে তিনি প্রকৃতই জীবন্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন,—“বাছা আমার কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে, কে তাহাকে আহার দিতেছে, কে তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইতেছে; তাহাকে না দেখিয়া নিদারুণ শোকের আগুনে আমার হাড় পুড়িয়া কয়লা হইয়া গিয়াছে, এখন মরিলেই বাঁচি।” গোস্বামী মহাশয়ও সকলকে এইরূপ প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতেন। ভালবাসিবার এই শক্তি তিনি তাঁহার মাতৃপ্রকৃতি হইতে লাভ করিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজগোপালের সূতিকা-ষষ্ঠী পূজার দিনে দেবী স্বর্ণময়ী উন্মাদিনী হন। এই উন্মাদ-অবস্থা তাঁহার ছয় মাস কাল ছিল। ইহার পর বহুবৎসরপর্য্যন্ত আর কোন উন্মাদলক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে নিদারুণ মানসিক কষ্টে তিনি পুনরায় উন্মাদিনী হন। কথিত আছে স্বর্ণময়ীর পিতামাতা অনেক দিন পর্য্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন; পরে একটী মুসলমান ফকিরের বরে তাঁহাদের সন্তান হয়। বরদানকালে স্বর্ণময়ীর পিতামাতা ফকিরের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ

করিলে দ্বিতীয়টী পুত্র অথবা কন্যা হউক, তাঁহাকে প্রদান করিবেন। ফকিরের বরে স্বর্ণময়ীর মাতা তিন কন্যা ও দুই পুত্র লাভ করেন; কিন্তু সময়কালে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করাতে ফকির ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দেন যে, "এই সন্তান অনেক সময় স্ববশে থাকিবে না"। দেবী স্বর্ণময়ীই তাঁহার পিতামাতার এই অভিশপ্ত দ্বিতীয় সন্তান। এই ঘটনার পর বহু-দিবস নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল; কিন্তু বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়। হঠাৎ ব্রজগোপালের সূতিকা-ষষ্ঠী পূজার দিবস স্নানঘাট হইতে প্রত্যাগমন সময় দেবী স্বর্ণময়ী ঘোর উন্মাদিনী হইয়া আসিলেন; এই অবস্থায় তিনি ফকিরী ভাষায় নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা বলিতেন।

দেবী স্বর্ণময়ী সদানন্দময়ী ছিলেন, বিষাদ তাঁহার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিত। নিরানন্দে কালযাপন করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল; তাঁহার নিকট অল্পক্ষণ বসিলেও প্রাণে আনন্দধারা প্রবাহিত হইত; তাঁহার স্নেহপূর্ণ মধুরবাক্যে প্রাণ শীতল হইয়া যাইত। ইহাঁর সদ্‌গুণ, ভগবদ্ভক্তি ও স্নেহময়ী মাতৃত্বে সকলে এরূপ মুগ্ধ ছিল যে, অনেকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিত। শিষ্যদিগকে তিনি নিজ পরিবারভুক্ত মনে করিতেন, তাহাদের বাটীগমনকালে প্রত্যেকের পুত্রকন্যার জন্য খেলনা, থালা, বাটী ও বস্ত্রাদি লইয়া যাইতেন।

দেশের ভাবী গৌরব-রবি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ ইহাঁরই গৃহে উদিত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে ইনি বিজয়কৃষ্ণের নিকট ঢাকায় ছিলেন।





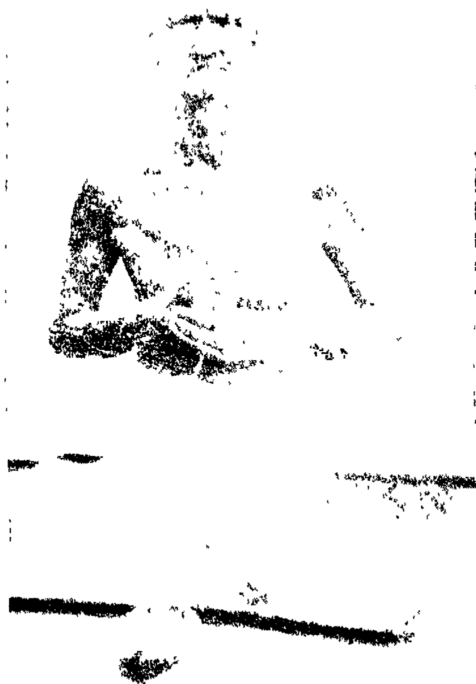
জন্ম ।

১২৪৮ সনের শ্রাবণমাস। সুমঙ্গল পূর্ণিমা তিথি। প্রাবৃটের প্রকৃতিসুন্দরী তাঁহার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা অঞ্চলখানিকে ধরাবক্ষে ছড়াইয়া দিয়াছেন। দিবাকর এইমাত্র অস্তমিত। সুবিমল সান্ধ্যসমীরণ মন্দ মন্দ বহিয়া জীবজগতের শ্রম অপনোদন করিতেছে। আজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা; সমগ্র গৌরমণ্ডল কৃষ্ণপ্রেমে মাতিয়া উঠিয়াছেন। আনন্দ আর ধরে না; বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী সকলেই আজ আনন্দে ভাসমান। সমীরণ যুঁই, জাতী, বেলী, বকুল, মল্লিকা, মাধবী, চামেলী, রজনীগন্ধাপ্রভৃতি কুসুমের সুগন্ধ বহন করিয়া জনগণের প্রাণে আনন্দ ঢালিয়া দিতেছে। দৈয়াল, কোকিল, পাপিয়া প্রভৃতি বিহগগণের আজ আর সঙ্গীতের বিরাম নাই। প্রতি দেবালয়ে মঙ্গল শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে; পুরোহিতগণ "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু" রবে উৎসবের মাঙ্গল্য সূচনা করিতেছেন। স্থানে স্থানে স্বস্তিবাচনাদি বেদ-মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। সকলের চিত্তই ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ। সকলেই আজ আনন্দে মাতোয়ারা। লগ্ন শুভ, গ্রহগণ তুঙ্গ স্থানে বিরাজিত, এই পরম শুভ মুহূর্ত্তে (বঙ্গাব্দ ১২৪৮ সন ১৯শে শ্রাবণ সোমবার দিবসে) নদীয়া জেলান্তর্গত শিকারপুরের নিকটবর্ত্তী দহকুল গ্রামের এক নিভৃত প্রান্তরে বৃক্ষতলে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ ভূমিষ্ট হইলেন। নবদ্বীপ-চন্দ্রমা নিমাইও নিম্ববৃক্ষতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণের মাতামহ স্বর্গীয় গৌরীপ্রসাদ জোদ্দার মহাশয় তৎকালে

একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় দাতা, পরোপকারী ও সহৃদয় ব্যক্তি দহকুলে অল্পই ছিল। তিনি নীলকুঠীর দেওয়ানী করিয়া বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধন-ভাণ্ডার বিপন্ন ব্যক্তিগণের জন্য সদাই উন্মুক্ত থাকিত। জোদ্দার মহাশয় কোন বিপন্ন ব্যক্তির জামিন হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। পরে মোকদ্দমার সময় লোকটী পলায়ন করে। ইহাতে তাঁহার বাটীর দ্রব্যাদি নিলামে ক্রোক হয়। এই দুর্ঘটনার দিন বিজয়কৃষ্ণ বাটীর পার্শ্বভাগে একটী পিঠুলী বৃক্ষতলে ভূমিষ্ঠ হন। ইহার অনতিদূরে একটী ডোবা ছিল। বর্ত্তমানে সেই ডোবাটীর একপার্শ্ব ভরাট হইয়া অপর পার্শ্ব ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে উক্ত পিঠুলী বৃক্ষের সম্মুখীন হইয়াছে। ডোবার চারিদিকে কচুবন ছিল। অদ্যাপি সেখানে বর্ষাকালে কচুগাছ জন্মিয়া থাকে। যেস্থানে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তদুপরি প্রাচীন পিটুলী বৃক্ষটীর একটী শাখা নত হইয়া অদ্যাপি ঐ পবিত্র ভূমির নিদর্শন ঘোষণা করিতেছে। বুঝি, মর্য্যাদা হানি-ভয়ে শাখা উহাকে সযত্নে আগুলিয়া রাখিয়াছে।

বিজয়কৃষ্ণের জন্মের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে দেবী স্বর্ণময়ী আমাশয়ের পীড়ায় কাতর ছিলেন। একদিকে প্রসূতির অসুস্থাবস্থা, অন্যদিকে দ্রব্যাদি ক্রোকের হাঙ্গামা। আমাশয়-পীড়িতা প্রসূতি বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী খিড়কী দিয়া উক্ত ডোবার ধারে শৌচে গমন করিয়াছিলেন, তথায় বালকের জন্ম হয়। ভয়াভিভূতা প্রসূতিকে সদ্যোজাত শিশুসন্তান সহ সূতিকাগারে আনয়ন করা হয়। জাতক ঘরে শেক, তাপ না হওয়ায়, কবিরাজ শিশুকে মুসর্ব্বর খাওয়াইতে উপদেশ দেন, কিন্তু প্রসূতি ভ্রম বশতঃ শিশুকে অহিফেন খাওয়াইয়া ফেলেন। ইহাতে ধনুষ্টঙ্কার হইয়া শিশু মৃতকল্প হয়; পরে শিশুদ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়াই যেন ভগবানের কৃপায় আপনা হইতেই বমনের সহিত অহিফেন বহির্গত হইয়া শিশুর জীবন রক্ষা পায়।



অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য।

...sh Printing Works

শান্তিপুরের অনেকে বলেন,—স্বর্ণময়ীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইলে তিনি অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী হইতে লাগিলেন। গ্রামের স্ত্রীলোকগণ বলিতে লাগিলেন,—"মাগীর এত রূপ ত কখন দেখি নাই, রূপ যেন ফেটে পড়ছে, হয় ত মাগী এবারে মরবে"। গর্ভাবস্থায় তিনি সূর্য্যরশ্মিতে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিতেন। এই সকল অদ্ভুত দর্শনের কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলিতেন, "মাগী বুঝি পুনরায় পাগল হয় দেখ্‌ছি।"





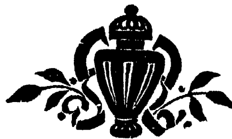
অন্নারম্ভ

"হস্তে হেম তাড়-বালা গলায় পদক মালা
কটিতটে মেখলা সুন্দর।
মস্তকে রত্ন টোপর পাগ অতি মনোহর
আভরণে শোভে কলেবর।
কোলে ক'রি আনি পুত্রে ভুঞ্জায় কনকপাত্রে
সঘৃতান্ন সুস্বাদু ব্যঞ্জন।"

বালকের জন্মের ছয় মাস পরে স্বর্ণময়ী শিশুকে লইয়া পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে আগমন করিলেন। অষ্টম মাসে সমারোহের সহিত অন্নপ্রাশন ও নামকরণ উৎসব সম্পন্ন হইল। পুত্রের অপূর্ব্ব রূপরাশি নিরীক্ষণ করিয়া পিতা আনন্দকিশোরের প্রত্যাশিত হৃদয় সুশীতল হইয়া উঠিল। বালকের অঙ্গে নানাবিধ সুলক্ষণদর্শনে আনন্দকিশোর নিজকে ধন্য মনে করিলেন। পূর্ব্বে শ্রীশ্রীপুরীধামে ভাবিপুত্রসম্বন্ধে তিনি যে স্বপ্ন পান তাহা সাফল্যে পরিণত হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। হৃদয়ে কত আশাকুসুম ফুটিয়া উঠিল; আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে বিহ্বল আনন্দকিশোরের চক্ষু হইতে দরদরিত ধারে আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। আত্মীয় পরিজনবর্গ তাঁহার ভাবগ্রহণে অসমর্থ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ষাট্ ষাট্, শুভদিনে কি চোখের জল ফেলে! ছেলের যে অকল্যাণ হবে!" আনন্দকিশোর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, আনন্দোচ্ছ্বাসে

বলিয়া ফেলিলেন—"আমি পূর্ব্ব হইতেই জানি, কে আমাদের পুত্ররূপে আসিতেছেন। জন্মজন্মান্তরীণ বহু তপস্যার ফলে এইরূপ পুত্র লাভ হয়। এ বড় সামান্য ছেলে নয়, প্রেম ভক্তির প্রভাবে ইনি সমস্ত দিক্ বিজয় করিবেন।" সর্ব্বত্র বিজয়ী হইবেন বলিয়াই ইহার "বিজয়কৃষ্ণ" নামকরণ হইল। শুনিয়াছি গোস্বামী মহাশয়ের রাশি-নাম "দিগ্‌বিজয়" ছিল।

অন্নপ্রাশন-উপলক্ষে আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় গ্রামস্থ সমস্ত জ্ঞাতিবর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান। পরম দয়ালু গোস্বামী মহাশয় এই উপলক্ষে বহু দরিদ্রকেও অন্ন দান করেন। সকলেই একবাক্যে বালকের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতে করিতে আহারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গৃহগমন করিয়াছিলেন। অন্নপ্রাশন-উপলক্ষে আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় শিশুকে নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছিলেন। হস্তে স্বর্ণবলয় ও বাজু, কটিতটে টোরা, কণ্ঠে পদক ও মস্তকস্থ সুচিক্কণ কেশাগ্রভাগ স্বর্ণ-নিমফলে সুশোভিত থাকায় বালকের রূপে গৃহের শোভা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইত যেন সাক্ষাৎ কুমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।





শৈশব-কাহিনী

শিশুকে দেখিবার জন্য, শিশুকে ক্রোড়ে করিবার জন্য, পাড়ার লোক, দেশের লোক, ছুটিয়া আসিত। যিনি একবার সেই অনুপম সুন্দর শিশুকে ক্রোড়ে লইতেন, তাঁহার আর তাঁহাকে নামাইতে বা অপরের ক্রোড়ে দিতে ইচ্ছা হইত না। সুতরাং জননী বড় একটা পুত্রকে কোলে করিতে অবসর পাইতেন না। শিশুর মধুর হাসি সকলের প্রাণে আনন্দধারা বর্ষণ করিত। বিজয়কৃষ্ণ যখন আঙ্গিনায় হামাগুড়ি দিতেন, তখন সকলেই একদৃষ্টে সেই অনিন্দ্যসুন্দর শোভা নিরীক্ষণ করিত। এইরূপে বিজয়কৃষ্ণ শশিকলার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। শিশুর প্রকৃতি দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইতেন। বালক রোদন করিতেছে, কেহই থামাইতে পারিতেছে না; তখন স্বর্ণময়ী বলিতেন, "শ্যামসুন্দরের শ্রীমন্দিরে লইয়া যাও, থামিবে এখন।" বাস্তবিক তাহাই হইত। রোরুদ্যমান শিশু ক্রীড়াপুত্তলিকা পাইলে যেরূপ চুপ করে, বিজয়ও সেইরূপ শ্যামসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি দেখিলে চুপ করিত। বিজয় তখন হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছে; এজন্য কোল হইতে নামাইয়া তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইত; একটু ফাঁক পাইলেই শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্যামসুন্দরকে জড়াইয়া ধরিতে যাইত। শিশুর সরল চাহনি সকলের চিত্ত হরণ করিয়া লইত। বিজয়ের একটী গুণ এই ছিল যে, তাহাকে কোলে লইলে শরীর আনন্দে পুলকিত হইত। শ্রীমুখের দিকে

চাহিলে লোক আর চক্ষুঃ ফিরাইয়া লইতে পারিত না ; পাছে লোকের চোখ লাগে, এজন্য জননী বালকের কপালে গোবরের টিপ্ পরাইয়া দিতেন। সর্ব্বাঙ্গে থুৎকুড়ি দিয়া মন্ত্র পড়িয়া পুত্রের প্রতিঅঙ্গ বিঘ্নবিনাশন জনার্দ্দনকে সঁপিয়া দিতেন।

জননী মনে করিতেন, আমার ভাগ্যে কি বাছা বাঁচবে! আবার পরক্ষণেই জিহ্বা দংশন করিয়া ভাবিতেন, ছি ছি, আমি কিনা জননী হ'য়ে আমার সোণার চাঁদের অমঙ্গল চিন্তা করিতেছি! সন্দিগ্ধ-হৃদয়া জননী পুত্রের রক্ষার জন্য দেশের সব দেব-দেবীকে মানৎ করিতেন। যে কোন সন্ন্যাসী দেখিলে পুত্রকে লইয়া রক্ষাবন্ধ করিয়া লইতেন।

শৈশবকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণত্ব প্রকাশ পায়। ঘোর সংগ্রামস্থলে শ্বেত পতাকা উড্ডীন হইবামাত্র যেমন সংগ্রাম বন্ধ হইয়া যায়, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড জলধারাপাতে যেরূপ নির্ব্বাপিত হয়, শিশু বিজয়কৃষ্ণের আগমনে প্রতিবেশিগণের প্রচণ্ড কলহও সেইরূপ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত। প্রতিবেশিগণ দেবশিশুজ্ঞানে বিজয়কে সমাদর করিতেন। কেহ গর্ভবতী হইলে তাহার শাশুড়ী ননদ আদি উপস্থিত হইয়া প্রসূতি পুত্র অথবা কন্যাসন্তান প্রসব করিবে বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেন। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই বালকের কথা কখনও অন্যথা হইবার নহে, বালক বাক্-সিদ্ধ। বাস্তবিক তাহাই ঘটিত। বালকের বাক্য কদাচ অন্যথা হইত না। যাহাকে যাহা বলিত, তাহাই ফলিয়া যাইত। পীড়িত ব্যক্তি তাহার রোগোন্মুক্তি ও মোকদ্দমাগ্রস্থ ব্যক্তি তাহার জয়পরাজয়ের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া যাইত। টোলের ছাত্রগণ দলে দলে আসিয়া তাহাদের অভীপ্সিত উপাধি পাইবে কিনা জানিবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিত। বালকও স্বভাবসুলভ মধুর ভাষায় তাহাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর করিত।

শিশুজীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভক্তিভাব আপনা-আপনি ফুটিয়া

উঠিয়াছিল। বালক ভক্তিভরে সকাল ও সন্ধ্যায় তুলসীতলায় গড়াগড়ি দিত। বৈশাখ মাসে তুলসী বৃক্ষে ঝারা দিবার রীতি আছে। বালক ঘটি লইয়া তুলসী বৃক্ষে জলসেচন করিত। জলপূর্ণ ঘটি উত্তোলন করিতে যাইয়া গুরুভার প্রযুক্ত কতবার পড়িয়া যাইত; কিন্তু তথাপি উহার উৎসাহহ্রাস হইত না। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে ঐ কার্য্য সম্পাদন করিত। বালকের ব্যবহার দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইত।

শিশুকাল হইতেই গোস্বামী মহাশয় সন্ন্যাসসাজে সজ্জিত হইতে ভালবাসিতেন। কাপড় ছিঁড়িয়া কৌপিন পরিধান করিতেন। বিজয়ের অপরূপ লাবণ্য, সুমধুর হাস্য ও আলুলায়িত কেশজালমধ্যগত তিলক-মালাশোভিত স্নিগ্ধ মুখমণ্ডল বড়ই সুন্দর দেখাইত। সকলেই প্রীতি-বিস্ফারিতনেত্রে শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া থাকিত।

বিজয়কৃষ্ণের বাল্যজীবন বিস্ময়কর ঘটনায় পরিপূর্ণ। বাক্য-স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তদীয় জীবনে অসাধারণত্ব প্রকাশ পায়। জননী ৺শ্যামসুন্দরের ভোগ নিজ হস্তে পাক করিতেন দেখিয়া বালক বিজয়কৃষ্ণের ইচ্ছা হইত, তিনিও তদনুরূপ নিজ হস্তে পাক করিয়া বিগ্রহের ভোগ দেন। জননী ছোট ছেলেকে যেরূপ কোলে করিয়া আদরের সহিত দুগ্ধ পান করান, তাঁহারও সাধ হইত, ছোট ছেলের ন্যায় বিগ্রহকে আদরের সহিত কোলে লইয়া দুগ্ধ পান করান। কোন কোন দিন বালক জেদ করিতেন যে, বিগ্রহের শ্রীমতী * পরিবেশন না করিলে আহার করিবেন না। এই সময়ে বালকের জেদ থামাইবার জন্য জননী ও বাটীর অন্যান্য পরিজনকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত।

একবার জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বে তিনি ৺বিগ্রহকে কোলে লইয়া দুগ্ধ পান

* গোস্বামী মহাশয়দিগের বাটীর প্রচলিত প্রথা এই যে, ভোগরন্ধনকার্য্য শেষ হইলে ৺বিগ্রহের ভোগাধিবেশনের পূর্ব্বে শ্রীমতীকে ভোগমন্দিরে আনয়ন করা হয়

করাইবার জন্য বায়না ধরিয়াছিলেন। জননী এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন যে, জন্মাষ্টমীর দিন ৺শ্যামসুন্দরের জন্ম হইবে, সেই দিন তাঁহাকে কোলে লইয়া দুগ্ধ খাওয়াইও। বালক জন্মাষ্টমীর দিন গণনা করিতে লাগিল। পরে জন্মাষ্টমী আসিল। বাদ্য বাজিতে লাগিল, বালক দুগ্ধের বাটী লইয়া সারানিশি এই প্রত্যাশায় জাগিয়া রহিল যে, আজ ঠাকুরকে কোলে লইবে—আদর করিবে। পরে যখন তাহাকে বলা হইল, বসুদেব নবপ্রসূত শ্যামসুন্দরকে নন্দালয়ে রাখিতে গিয়াছেন, তখন বালক নিজ হস্ত-পদ আছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অনুপবীত বালক বলিয়া ৺বিগ্রহকে স্পর্শ করিতে দেওয়া হইত না। একদিন পূজারি মাধ্যাহ্নিক-ভোগের পর বিগ্রহকে শয়ন দিয়া চলিয়া গেলে বালক গোপনে দুগ্ধ লইয়া শায়িত বিগ্রহের মুখে ঢালিয়া দেয় এবং পার্শ্বে শয়ন করিয়া কত আদর, কত মুখচুম্বন করিতে থাকে। ঘটনা প্রকাশ পাইলে, বিগ্রহকে স্পর্শ করার জন্য বাটীতে আন্দোলন উঠে; পরে বিগ্রহকে পুনরায় সংস্কার করিয়া লওয়া হয়। ভবিষ্যতে আর এরূপ যাহাতে না ঘটিতে পারে, সে জন্য সকলে সতর্কতা অবলম্বন করেন।

অতি শৈশবে গোস্বামী মহাশয় একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন। পুত্রের অদর্শনে কাতরা জননী চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিয়াও বালকের কোনও সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে

এবং ভোগ প্রদানকালে শ্রীমতী ৺বিগ্রহের দক্ষিণে উপবেশন করেন। এইরূপ রীতি শান্তিপুরের অন্যত্র পরিদৃষ্ট হয় না। সেবাইতগণ শ্রীমতীর অগ্রে ভোগমন্দিরে আগমন করিবার এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন;—"শ্রীমতী আসিয়া পতির অভিরুচি-মত পরিবেশন ও আহারীয় দ্রব্যাদি সজ্জিত করিয়া না দিলে ঠাকুর আহারে পরিতৃপ্ত হন না। স্বামীর পরিতৃপ্তির জন্যই শ্রীমতী অগ্রে ভোগমন্দিরে আগমন করেন।" এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়াই বালক বিজয়কৃষ্ণ আবদার করিতেন যখন শ্রীমতী শ্যাম-সুন্দরকে পরিবেশন করিতে পারেন, তখন আমাকে কেন করিবেন না?

ছাদে উঠিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, নিকটবর্ত্তী জঙ্গলমধ্যস্থ বিল্বমূলে দিগম্বর বিজয় বনদেবতার ন্যায় বনঃ আলো করিয়া বসিয়া আছে। হারানিধির সন্ধান পাইয়া জননীর দেহে প্রাণ আসিল। তিনি তাড়াতাড়ি পুত্রসম্মুখে আসিয়া দেখিলেন, বালক সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। অনেক ডাকাডাকিতেও উত্তর নাই। বিজয় তখন কোন্ ভাবসাগরে নিমগ্ন আছেন, কোন্ প্রেমামৃতধারায় স্নান করিতেছেন, কোন্ মহাভাবে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন, তাহা জননী বুঝিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর, বিজয় নয়নোন্মীলন করিয়া সম্মুখে জননীকে দেখিলেন এবং মা-মা রবে বাহুদ্বয় প্রসারণ করিয়া তাড়াতাড়ি জননীর কোলে উঠিবার আগ্রহ করিলেন। জননীও পুত্রকে কোলে লইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

আর একদিন কার্ত্তিকমাসে জননী স্বর্ণময়ী ৺শ্যামসুন্দরের মঙ্গল আরতি দর্শন করিয়া কিছুক্ষণ পরে প্রভাতে গৃহে আসিয়া দেখেন শয্যায় বিজয় নাই। ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন যে, বিজয় ৺শ্যামসুন্দরের শ্রীমন্দিরের রুদ্ধদ্বার ঠেলাঠেলি করিতেছে; দ্বার উন্মোচন না করিতে পারিয়া কখনও দ্বার খুলিবার জন্য ৺শ্যামসুন্দরকে কাকুতি মিনতি করিতেছে, কখনও বা প্রণয়কোপে তিরস্কার করিতেছে। এইরূপে সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হইতে দেখিয়া প্রভুর শ্রীবিগ্রহকে বিস্মৃত বালক আরক্ত-নয়নে শাসাইতেছে—'একটু পরে দুয়ার খুলিলে তোমাকে কে রক্ষা করিবে দেখিব?' এই বলিয়া দীর্ঘ যষ্টিহস্তে বালক দ্বারের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পূজারি আসিয়া দ্বার খুলিল। কিন্তু অনুপবীত বালক শ্রীমন্দিরে প্রবেশলাভ করিতে পারিল না। তখন বালক রাগে (কি অনুরাগে কে বলিবে?) ৺শ্যামসুন্দরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—"আমার ভাঁটা চুরি করিয়া পলাইয়া

আসিলে! আবার আমাকে ঘরে যাইতে দেওয়া হইল না! আচ্ছা, কাল আবার খেলিতে আসিও? আমি এর প্রতিশোধ না লইয়া জল-গ্রহণ করিব না!” সেদিন আর বালক কিছুতেই আহার করিল না। জননী অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি শয়নগৃহে অন্ন রাখিয়া শয়ন করিলেন। মধ্যরাত্রে জননী দেখিলেন প্রেমাবিষ্ট বালক শয্যাত্যাগ করিয়া শ্যামসুন্দরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে,—“যাই, আমার কাছে ঘাট মানিলে, তাই বাঁচিলে! নতুবা আজ তোমাকে ভাল করিয়া মজা দেখাইতাম!” আবার বালক বলিতে লাগিল,—“আমি যেন ভাই তোমার উপর রাগ করিয়া খাই নাই! তুমিও কেন আজ খাও নাই? এখন এস দুইজনে খাই!” এই বলিয়া বালক আহারে বসিল এবং আহারশেষে পুনরায় শয়ন করিল। এইরূপ অলৌকিক ঘটনা দেখিতে দেখিতে জননী স্বর্ণময়ী একরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন;—পূর্ব্বের ন্যায় পরে আর ভীত হইতেন না। আশ্চর্য্য যে, পরদিন বালককে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে কিছুই বলিতে পারিল না। তবে, সেই রাত্রিতে পূজারী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের মাধ্যাহ্নিক ভোগ হয় নাই!

“প্রভুর বয়স তখন ছয় কি সাত বৎসর, সেই সময় আমাদের গৃহে একজন সন্ন্যাসী আগমন করেন। স্নানান্তে সাধুকে সচন্দন তুলসী-দ্বারা শালগ্রামশিলার পূজা করিতে দেখিয়া প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি পূজার সামগ্রী আনিতে ছুটিলেন। পরে ফুল ও পাতায় কোঁচড় ভরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সাধুকে আসিয়া বলিলেন “ও সন্নিসী! আমায় তোমার ঠাকুরটী দাওনা, আমিও তোমার মত পূজো কর্ব্বো, দেখনা কত ভাল ভাল ফুল এনেছি!” এই বলিয়া বালক ঠাকুরকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে সকলেই “সর্ব্বনাশ! কি করে, কি করে!”

বলিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। বাধা পাইয়া অভিমানে তিনি কান্না জুড়িয়া দিলেন ও ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বালককে না ভুলাইলেও নয় দেখিয়া সাধু একখণ্ড প্রস্তর প্রদান করিয়া বলিলেন, "এই লও খোকা দিব্যি ঠাকুর, ভাল করিয়া পূজা করিও।" ঠাকুর পাইয়া শিশুর আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। শরতের মেঘ হইতে উজ্জ্বল চন্দ্রমা ফুটিয়া আকাশকে যেরূপ আলোকিত করিয়া দেয়, হঠাৎ রোরুদ্যমান শিশুমুখে হাসি বাহির হইয়া তাহার সরল মুখ সেইরূপ আলোকিত করিয়া তুলিল। আমাদের প্রভুর পূজার বড় ঘটা লাগিয়া গেল। প্রভু প্রাতে উঠিয়া ঠাকুরকে স্নান করাইয়া সুগন্ধি-কুসুমে সাজাইতে আরম্ভ করিলেন। চন্দনচর্চ্চিত তুলসীদল ঠাকুরের উপর রাখিয়া মনে যাহা আসিত, নিজের মধুর ভাষায় তাহাই বলিয়া ঠাকুরের পূজা করিতেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব পূজা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিত। পূজান্তে আহারীয় দ্রব্য আনিয়া ঠাকুরের সম্মুখে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিতেন। কখন কখনও নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিতেন, ঠাকুর আহার করেন কি না। আহারান্তে ঠাকুরকে ফুলশয্যায় শয়ন করাইতেন, শয্যার চতুর্দ্দিকে সাধের পিক্‌দান, পানদান, আতরদান রক্ষিত হইত, প্রভু কোমল শিশুহস্তে ঠাকুরকে ব্যজন করিতেন। অচিরকালমধ্যে বালকের সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প প্রচারিত হইতে লাগিল এবং প্রতিদিন আমার সোণার প্রভুকে দেখিবার জন্য বাটী লোকারণ্য হইতে লাগিল।

সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি দেবী স্বর্ণময়ী গল্পচ্ছলে প্রভুর অদ্ভুত জন্মবিবরণ সকলের সমক্ষে এইরূপ প্রকাশ করিতেন, আমার স্বামী পুরীধামে গমন করিয়া একদিন নিশীথে স্বপ্ন দেখিলেন যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—"আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ

করিব। গত জন্মে আমার যে কার্য্যটুকু অবশিষ্ট আছে, বর্ত্তমান জন্মে তাহাই সম্পাদন জন্য আমি পুনরায় আমারই বংশে তোমাকে যোগ্য ব্যক্তি দেখিয়া, তোমার পুত্ররূপে আগমন করিতেছি। এই স্বপ্ন-দর্শনের পরদিবস তিনি মহানন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ঐ বৎসর শ্রীশ্রীরাসপূর্ণিমার দিবস আমি ৺শ্যামসুন্দরের রাসপূজা দর্শন করিয়া গৃহাগত হইতেছি; দেখিলাম, ৺বিগ্রহের দেহ হইতে একটী জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি বাহির হইয়া আমার অঞ্চল ধারণপূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে গৃহাগমন করিল। আমি ভয়ে চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু ফিরিয়া কিছুই দেখিলাম না। ঐদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম, একটী শিশু আসিয়া বলিতেছে—মা! আমি তোমার নিকট আসিলাম! সেই দিনই আমার গর্ভসঞ্চার হয়। গর্ভাবস্থায় আমি নানাবিধ দেব দেবী দর্শন করিতাম। সূর্য্যের প্রতি-রশ্মিতে বৃক্ষাদির প্রতি-পত্রে রাধাকৃষ্ণ দর্শন করিতাম। শয়ন করিয়া আছি, দেখিতাম, আমার গর্ভস্থ সন্তান বাহির হইয়া আমার পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে; তাহার অঙ্গপ্রভায় গৃহ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আমি চলিয়া যাইতাম, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে যেন নুপূর পায়ে দিয়া আমার অনুসরণ করিত। আমি সর্ব্বদা ভয় পাইতাম। কোন কোনও দিন গৃহ স্বর্গীয় গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিত, কে যেন এককালে শত শত আতর গোলাপের ভাণ্ডার খুলিয়া দিত, কিছুতেই কিছু বুঝিতে পারিতাম না। ভীত হইয়া স্বামীর নিকট গল্প করিতাম; তিনি অভয় প্রদান করিয়া বলিতেন, তোমার গর্ভে বড় সাধারণ ছেলে আসেন নাই, আমি জানি, এরূপ কত হবে এবং অপরের নিকট এ সকল বলিতে নিষেধ করিতেন; কিন্তু আমার পেটে কথা এক দণ্ডও জীর্ণ হইত না।”

কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী প্রত্যাগমন করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘দেখি তোমার ঠাকুর কি কর্‌ছেন।’ ঠাকুর দেখিয়া সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি গম্ভীর হইয়া উঠিল, মুহূর্ত্তমধ্যে কৌতুক কোথায় চলিয়া গেল।

পরে তিনি জননী স্বর্ণময়ীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মা, তোমার এ সামান্য সন্তান নহে, ঠাকুর জাগ্রৎ হইয়াছেন।' কথা শুনিয়া স্বর্ণময়ী ভীতা হইলেন, পাছে সেবা-অপরাধে পুত্রের অমঙ্গল হয়, এই আশঙ্কায় প্রস্তর-খণ্ড সন্ন্যাসীর নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন। ঠাকুরের শোকে প্রভু দুইদিন আহার করেন নাই। *

পাঁচ ছয় বৎসরের শিশু বিজয়কৃষ্ণ ধ্রুব ও প্রহ্লাদের আখ্যায়িকা শুনিয়া ভক্তিতে গদগদ হইয়া উঠিত ও তাহার নয়নে অশ্রু ঝরিত। তৎকালে সেই মুখের দিকে যে দৃষ্টিপাত করিত, তাহার হৃদয়েও গভীর ভক্তির ভাব সঞ্চারিত হইত।

বিজয়কৃষ্ণের বাল্যজীবনে আরও একটী অতি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বালক অনেকক্ষণ বসিয়াছিল, তৎকালে তাহার কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান ছিল না। আত্মীয়-স্বজনের অনেক ডাকাডাকির পর যেন চমক ভাঙ্গিল। পরে যখন সকলে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন তখন বালক বলিল, "আজ বাবা আমায় চাঁদের রাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন।

* উপরি-উক্ত বিবরণটী যাঁহার দ্বারা কথিত, সেই সাধ্বী রমণী ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কালাবাধা গ্রামে বাস করিতেছেন। তিনি পদ্মমণি নামে সাধারণের নিকট সুপরিচিত।

পদ্মমণির মা-যশোদার ভাব—

তিনি গোস্বামী মহাশয়কে বাল্যকাল হইতেই সাক্ষাৎ গোপালজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। এক্ষণে ইহাঁর গৃহে গোস্বামী মহাশয়ের নিত্যসেবা প্রতিষ্ঠিত। ক্ষীর শর তৈয়ারী করিয়া পদ্মমণি গোস্বামী মহাশয়কে প্রদান করেন, সাক্ষাৎ বর্ত্তমান জ্ঞানে মুখে তুলিয়া দেন। কোনও দিন সময়মত ভোগাদি প্রদত্ত না হইলে গোস্বামী মহাশয়ের ক্রোধ ভঙ্গ করিবার জন্য কত সাধ্য সাধনা করেন, আরও বলেন যে, আমার বিজয়কৃষ্ণ "শয়নে স্বপনে, ধ্যানে মনে" আমি ঐরূপ দেখি।

আমাকে তাঁহার কোলে বসাইয়া কত নদী, কত পাহাড়, কত সুন্দর সুন্দর ফুল-বাগান দেখাইয়া বলিলেন, 'দেখ বাবা, আমার বংশে একজন খুব বড় সাধু, আর একজন খুব বড় বৈষ্ণব হইবে। তুই কি সেই বড় সাধু হইতে পারিবি?' আমি বলিলাম, হাঁ বাবা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমি পারবো। তারপর আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।" এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনায় পরিবারস্থ সকলে ভীত হইয়া পড়েন। বালকের মঙ্গল কামনায় ৺শ্যামসুন্দরের চরণামৃত ও শঙ্খের জল পান করান হয় এবং এই সময় হইতে বিজ্ঞ জনের পরামর্শে ভ্রাতৃদ্বয় পিতার সংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিয়া সমারোহে ব্রাহ্মণভোজনাদি করাইতেন, এখনও এই বংশে ঐ দিনে বিশেষ সমারোহ না হইলেও দুই চারি জন ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া উহা স্মরণীয় করিয়া রাখা হইয়াছে।

মহাত্মা গোপীমাধব গোস্বামী, আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ছিলেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি পরলোক গমনকালে গঙ্গাতীরে বিপত্নীক কনিষ্ঠ আনন্দকিশোরকে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়া এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেন যে, তাঁহার সন্তান হইলে যেন একটী তাঁহার বিধবা পত্নীকে দত্তকস্বরূপ প্রদান করা হয়। যথাসময়ে প্রতিশ্রুতিমতে আনন্দকিশোর গোস্বামী পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন এবং তাঁহার পত্নী দেবী স্বর্ণময়ীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়কৃষ্ণকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর হস্তে দত্তকস্বরূপ প্রদান করিবার পূর্ব্বেই আনন্দকিশোর গোস্বামী নিত্যানন্দধামে গমন করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী স্বর্ণময়ীই শেষে পাঁচ বৎসরের শিশু বিজয়কৃষ্ণকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার হস্তে দত্তক প্রদান করিয়া স্বামীর প্রতিশ্রুতি পালন করেন। শান্তিপুরের তৎকালীন প্রসিদ্ধ জমিদার ৺উমেশচন্দ্র রায় (মতিবাবু) এবং স্বনামখ্যাত বড়-গোস্বামী-বাড়ীর সেবাইত, পরোপকারী, সুপণ্ডিত কানাইলাল গোস্বামিপ্রভৃতি ব্যক্তি-

গণের সম্মুখে যথাশাস্ত্র যাগ যজ্ঞ এবং লেখাপড়া করিয়া কৃষ্ণমণি বিজয়কৃষ্ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। *

* গোস্বামী মহাশয়ের জীবনচরিতলেখক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী কর ও পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়, উভয়েই নিজ নিজ পুস্তকে এই দত্তকগ্রহণ সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ। আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় জীবদ্দশায় দত্তক প্রদান করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তির পর, তদীয় সহধর্ম্মিণী স্বর্ণময়ী দেবী এই কার্য্য সম্পন্ন করেন। তখন বিজয়কৃষ্ণের বয়স পাঁচ বৎসর। বিজয়কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া শ্রীযুক্তা সুখদাময়ী দেবী এখনও বর্ত্তমান আছেন। গোস্বামী মহাশয়ের বাল্য ও কিশোর বয়সের ঘটনাদি জ্ঞাত হইতে হইলে তাঁহার নিকট ব্যতীত সঠিক সংবাদ পাইবার অন্য উপায় নাই। গোস্বামী মহাশয়ের বার বৎসর বয়সের সময় ইনি এই পরিবারভুক্তা হন।

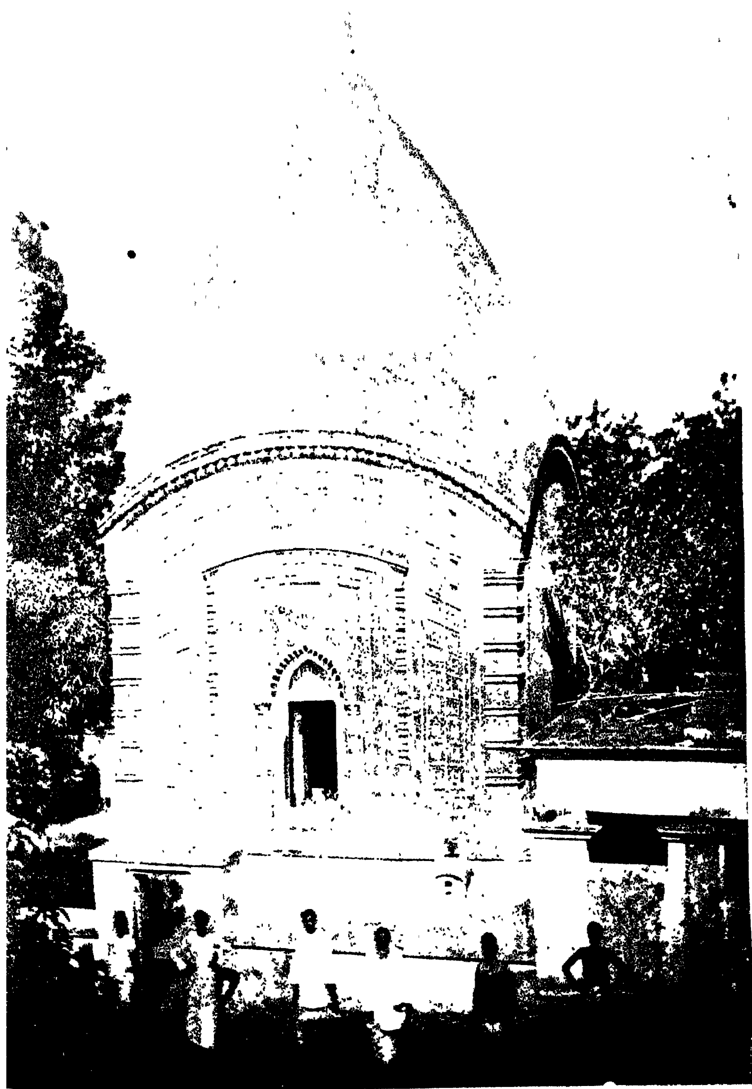




পাঠশালায় অধ্যয়ন ও বাল্যলীলা।

গোস্বামী মহাশয় গর্ভধারিণীকে 'মা' এবং দত্তকগ্রহিত্রী কৃষ্ণমণিকে 'মা জননী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পঞ্চম বৎসর বয়সে শুভদিনে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় এবং সেই সময় হইতেই তথনকার প্রসিদ্ধ গুরু ভগবান্ পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠশালায় প্রেরিত হন। গুরু মহাশয় শিক্ষাদান অপেক্ষা শাসনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কোনও ছাত্র তাঁহার কঠোর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিত না। কেবল বিজয়কৃষ্ণই সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে তাঁহার কঠোর শাসনকবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেন। তিনি প্রায়ই গুরুমহাশয়কে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া ৺শ্যামসুন্দর বিগ্রহের ভোগের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আহার করাইতেন এবং শিষ্যদত্ত বস্ত্রাদি বাটী হইতে গোপনে লইয়া গিয়া গুরুমহাশয়কে প্রদান করিতেন। এই সমস্ত কারণে তিনি গুরুমহাশয়ের বড়ই প্রিয়পাত্র ছিলেন। এইরূপভাবে গুরুমহাশয়কে সন্তুষ্ট রাখিয়া তিনি যে পাঠে অমনোযোগী ছিলেন তাহা নহে। তিনি চঞ্চলপ্রকৃতি ও দুষ্ট বালক হইলেও বড়ই মেধাবী ছিলেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অতীব প্রবল ছিল। একবার যাহা শ্রবণ বা পাঠ করিতেন, তাহাই কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত, সেই কারণে তিনি যথন যে শ্রেণীতে পাঠ করিতেন, সেই শ্রেণীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বালক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই গুরুমহাশয়ের মৃত্যুর অদ্ভুত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

গোস্বামী মহাশয় স্বহস্তে লিখিয়াছেন, “শান্তিপুরে ভগবান গুরুমহাশয়। তখন শান্তিপুরে ইংরাজী স্কুল ছিল না, গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ও টোল। এই গুরুমহাশয় বড় মারিতেন। বড় রাগিলে “গাড়ামাড়া” এই শব্দ ব্যবহার করিতেন। একদা তিনি বালক শিষ্যদিগকে বলিলেন, ‘ওরে ছোঁড়ারা, কা’ল সকালে আসিস্, এক সঙ্গে গঙ্গায় নাইতে যাব, সেখানে আমি দেহত্যাগ করিব। রাত্রিতে এই সংবাদ শান্তিপুরময় ব্যাপ্ত হওয়ায় পরদিন পূর্ব্বাহ্নে পাঠশালা স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধে পরিপূর্ণ হইল। গুরুমহাশয় সকলকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পুত্রটীকে লইয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাযাত্রা করিলেন। গঙ্গায় গিয়া প্রথমে স্নান আহ্নিক করিয়া সকলকে প্রণাম করিলেন এবং তৎপরে গঙ্গার জলে বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। ক্রমে জনতায় গঙ্গার ঘাট পূর্ণ হইয়া গেল। জয়ধ্বনিতে যেন গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল। এইরূপে জপ শেষ করিয়া গুরুমহাশয় বলিলেন, “ছেলে সব, আমি কায়স্থ, তোমরা অনেকে ব্রাহ্মণ, আমি কত তাড়না করিয়াছি, বাপু সকল, এখন তোমরা মাথায় পা দেও, আর দেরি নাই, ঐ দেখ রথ আসিল।” এই বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। প্রাণ দেহকে ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠের দিকে ধাবিত হইল। আশ্চর্য্য যে, মৃত দেহ পড়িয়া গেল না। সমস্ত ব্রাহ্মণ ছাত্র, যেমন পিতামাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে হয়, তদ্রূপ করিলেন।” যাঁহার স্নিগ্ধ শীতল পাদচ্ছায়ায় শত শত নর-নারী নিজ জীবনকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহার প্রথম শিক্ষা এই গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় আরম্ভ হয়। শিক্ষা, সংসর্গ ও বংশের প্রভাব অতিক্রম করা মানবের পক্ষে সহজ নহে। পূর্ব্বপুরুষগণের ভক্তি-পূত শোণিত-প্রবাহ দেহে বর্ত্তমান থাকায় এবং তপস্যানিরত হরিভক্তি-পরায়ণ অধ্যাপকের সংস্রবে শিক্ষা লাভ করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের বাল্যজীবন অপূর্ব্ব ভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।



শ্রী শ্রীজলেশ্বর শিব

বাল্যকালে তিনি বড় চতুর ও দুষ্ট বালক ছিলেন। তাঁহার মধুময় চরিত্রে একদিকে প্রেম, ভক্তি, বিনয়, অন্যদিকে বাল্যচঞ্চলতা, ফুল্ল কুসুমের ন্যায় মনোহর ও বিস্ময়োৎপাদক হইয়াছিল। তাঁহার উপদ্রবে বাটীর সকলকে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতে হইত। খাদ্যদ্রব্য যেখানে রাখা হইত, বালক বিজয়কৃষ্ণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতেন এবং গোপনে তাহা খাইয়া ফেলিতেন। ঠাকুরের ভোগের অনিবেদিত সন্দেশাদি অনেক সময়েই বিজয়কৃষ্ণ উদরসাৎ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। পুনরায় বাজার হইতে আনিয়া বিগ্রহের ভোগ দিতে হইত। যদি কোনও উচ্চস্থানে খাদ্য দ্রব্যাদি রক্ষিত হইত, তাহা হইলে গামলা বা বগুনার উপর উঠিয়া সেই সমস্ত আহারীয় পাড়িয়া লইতেন। এইরূপ করিতে একবার পড়িয়া গিয়া তাঁহার চিবুক কাটিয়া যায়। আজীবন তাঁহার সে ক্ষতচিহ্ন ছিল। বাল্যকালের দুষ্টামীর কথা উঠিলেই তিনি তাহা দেখাইতেন।

জ্যেষ্ঠ ব্রজগোপাল কিন্তু শান্তপ্রকৃতির ছিলেন। কনিষ্ঠের তাড়না অনেক সময়ে তাঁহাকে ভোগ করিতে হইত। রাত্রে ভোগের দ্রব্যাদি হইতে দুই ভ্রাতার প্রাতঃকালীন ভোজনের জন্য কিছু কিছু রাখা হইত। বিজয়কৃষ্ণ প্রাতে নিজের ভাগ পাওয়ামাত্র দাদার ভাগ কাড়িয়া খাইতেন। যখন বলে পারিতেন না, তখন অনুনয়বিনয়দ্বারা, অথবা কাঁদিয়া কাটিয়া দাদার ভাগ হইতে কিছু আদায় করিতেন। অনেক সময় ব্রজগোপালকে কাঁদাইবার জন্য নিজের ভাগের দ্রব্যাদি লুকাইয়া রাখিয়া বলিতেন, "দাদা, আমার ফুরাইয়া গিয়াছে, আমায় একটু দেও না"। যখন দাদা ভালবাসিয়া কিছু দিতেন, তখন দাদার সহিত একত্রে তাহাই আহার করিতেন। শেষে দাদার খাওয়া হইয়া গেলে, নিজের ভাগ বাহির করিয়া দাদাকে দেখাইয়া দেখাইয়া আহার করিতেন। তখন ব্রজগোপাল কাঁদিতে থাকিত এবং তাঁহাকে বেশী রাগাইবার জন্য খাদ্যদ্রব্য তাঁহার মুখের কাছে একবার ধরিতেন—একবার টানিয়া লইতেন।

বিজয় বাল্যকালে কুকুর, বিড়াল, পায়রা, পাখী প্রভৃতির প্রতি বড়ই অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে প্রতিবেশিগণের কিছুই পুষিবার উপায় ছিল না। যে যাহা পুষিত, তিনি তাহাই চুরি করিয়া নিজের বাটীতে আনিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। কেহ কিছু বলিতে আসিলে, তাহাদের সহিত ঝগড়া করিতেন। একবার একজনের একটা পাখী চুরি করিয়া আনেন, সে পাখীটা পড়িতে পারিত। পাখীটা আনিয়া বাটীর আম গাছে ঝুলাইয়া রাখেন। যাহাদের পাখী, তাহারা বহুস্থানে অনুসন্ধান করিয়া পরে বিজয়কৃষ্ণের নিকট খুঁজিতে আসিল। বিজয়কে তাহার পাখীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেই হঠাৎ পাখীটা "চাচা মুই গাছে আছু!" বলিয়া উঠিল। তখন তাহারা গাছ হইতে নানাইয়া পাখীটা লইয়া গেল। বালক বিজয় কাঁদিয়া কাটিয়া বাটী যেন রসাতলে দিতে লাগিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ দত্তক-গ্রহিত্রী-মাতা কৃষ্ণমণির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। প্রথম প্রথম তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতেই চাহিতেন না। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 'তিনি বলিতেন, আমি মা ছাড়িয়া অপরকে মা বলিতে পারিব না।" প্রথম অবস্থায় কৃষ্ণমণির নিকটে আহার বা শয়ন কিছুই করিতেন না। ডাকিলে বলিতেন, "আমার মার ঘর ছাড়িয়া তোমার ঘরে কেন যাব!" ভর্ৎসনা বা তিরস্কার-দ্বারা যখন কোনও ফলোদয় হইল না, তখন তিনি জমিদার উমেশচন্দ্র রায়কে (মতি বাবু) পত্রদ্বারা জানাইলেন যে, আমি পোষ্যপুত্র নামঞ্জুর করিলাম। কারণ বালক আমার অবাধ্য, সে আমাকে গ্রাহ্যই করে না ইত্যাদি। জননী স্বর্ণময়ীকে ভয়প্রদর্শনের জন্যই কৃষ্ণমণি এইরূপ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি মনে করিতেন যে, জননীর কুপরামর্শেই বালক ঐরূপ করিতেছে। কিন্তু স্বর্ণময়ী সহজে ভীত হইবার পাত্রী ছিলেন না; ফলে এই হইল যে, তিনি রাগ

করিয়া পুত্রকে কাড়িয়া লইলেন। এইরূপে কিছুদিন মনোমালিন্যের পর, ধীরে ধীরে সমস্ত মিটিয়া যায়; তখন কৃষ্ণমণি বিজয়কৃষ্ণকে উপনয়ন দিবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহাকে তাঁহার গর্ভধারিণী স্বর্ণময়ীর নিকট রাখিয়া অর্থসংস্থান জন্য শিষ্যালয়ে গমন করেন। কৃষ্ণমণির অনুপস্থিতির সময়ে স্বর্ণময়ীরও শিষ্যালয়ে গমনের প্রয়োজন হয়। তখন তিনি বিজয়কৃষ্ণকে মাতুলালয় শিকারপুরে প্রেরণ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজগোপালসহ শিষ্যালয়ে গমন করেন। কিছুদিন পরে কৃষ্ণমণি পুত্রের উপনয়নযোগ্য দ্রব্যাদি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি বাটী আসিলে উপনয়ন-সংস্কারের দিন স্থির ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমস্তই সংগৃহীত হইল এবং বিজয়কৃষ্ণকে শান্তিপুরে আনিবার জন্য তাঁহার মাতুলালয়ে সংবাদ পাঠানও হইল। ইতিমধ্যে বিষাদের করাল ছায়া সংসারে পতিত হয়। দুরন্ত বিসূচিকা রোগে মা জননী কৃষ্ণমণিকে ইহলোকের সমস্ত আয়োজন ফেলিয়া অনন্তপথের যাত্রী হইতে হইল। এই দুঃসংবাদ যত শীঘ্র বিজয়কৃষ্ণের নিকট পৌঁছান উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। কারণ তাঁহার কোনও জ্ঞাতি-ভ্রাতা স্বার্থান্ধ হইয়া কৃষ্ণমণির পরিত্যক্ত বিষয়াদি হস্তগত করিবার জন্য এইরূপ চক্রান্ত করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের দিন তাঁহার মাসী-মাতা ভবতারিণী দেবীর সহিত বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মা-জননীর সমস্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইয়াছে। বসিবার আসনখানি পর্য্যন্তও নাই। কৃষ্ণমণির সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবার আশায় উক্ত জ্ঞাতিভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণকে শ্রাদ্ধপর্য্যন্তও করিতে দেন নাই। মনোমালিন্যের সময় কৃষ্ণমণি মতি বাবুকে বালকের অবাধ্যতাপ্রভৃতি উল্লেখ করিয়া যে পত্র লেখেন, এক্ষণে সেই পত্রানুযায়ী বিজয়কৃষ্ণকে বিষয়-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার কূট অভিপ্রায়ে উক্ত জ্ঞাতি-ভ্রাতা নিজে শ্রাদ্ধাদিকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। এইরূপ দুর্ব্যবহারে বিজয়কৃষ্ণ মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিলেন এবং সেই দিনই তদীয় মাসী-মাতার

সহিত পুনরায় মাতুলালয়ে প্রত্যাগমন করেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই জননী স্বর্ণময়ী জ্যেষ্ঠপুত্র সমভিব্যাবহারে শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এই সমস্ত অবগত হইয়া তখনই লোক প্রেরণপূর্ব্বক বিজয়কৃষ্ণকে আনয়ন করিলেন এবং এই সময় হইতে বিজয়কৃষ্ণের ভরণ-পোষণের ভার পুনরায় গর্ভধারিণীর উপর পতিত হইল।

ভগবান্ গুরুমহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পাঠশালা উঠিয়া যায়। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে হেজল নামে জনৈক পাদ্রি-সাহেব, শান্তিপুরের এক ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বাংশে বানকের কুঠী নামে নীলকুঠির পরিত্যক্ত বাটী লইয়া একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভগবান্ গুরুমহাশয়ের পাঠশালা উঠিয়া গেলে বিজয়কৃষ্ণ এই বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা তিনটী বিভাগ ছিল। গোস্বামী মহাশয়েরা উভয় সহোদরই সংস্কৃতবিভাগে প্রবিষ্ট হন। এই বিদ্যালয়ে প্রায় বার শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত। এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কালে বিজয়কৃষ্ণের সহিত সাধু অঘোরনাথের পরিচয় হয়। শান্তিপুর বেজপাড়ার বৈদ্যবংশে সাধু অঘোরনাথের জন্ম।

সংসারনির্ব্বাহের ব্যয়সঙ্কুলানজন্য বিজয়কৃষ্ণের মাতাঠাকুরাণীকে অনেক সময়েই শিষ্যালয়ে অবস্থান করিতে হইত। ভ্রাতৃদ্বয়ও অধিকাংশ সময়ই জননীর সহিত শিষ্যালয়ে অবস্থান করায় উভয় সহোদরেরই শিক্ষালাভের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। সেইজন্য ইঁহাদের অধিক বয়স পর্য্যন্ত হেজল সাহেবের স্কুলে পাঠ করিতে হয়। বালক বিজয়কৃষ্ণের সদ্‌গুণাবলীদর্শনে বিশেষতঃ বাইবেল পাঠে অনুরাগ দেখিয়া হেজল সাহেব তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। এই সময়ে পাণ্ডুয়াপর্য্যন্ত নূতন রেলপথ বিস্তৃত হয়। বিদ্যালয়ের সমস্ত বালকের ইচ্ছা হয় যে, তাহারা একদিন রেল দেখিতে গমন করিবে। বিজয়কৃষ্ণ সকলের অগ্রণী হইয়া সাহেবের নিকট ইহার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইহাতে সাহেব একদিন

সমস্ত অধ্যাপকসহ ছাত্রগণকে নিজব্যয়ে রেলভ্রমণ করাইয়া তাহাদের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করেন।

বাল্যকালে বিজয়কৃষ্ণ যাত্রা-গান শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। শান্তিপুরে যখন যেখানে যাত্রার নাম শুনিতেন, সঙ্গিগণসহ সেখানে ছুটিয়া যাইতেন। যাত্রা শুনিতে বসিলে তাঁহার আহারনিদ্রাজ্ঞান থাকিত না। কথাপ্রসঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের বালকগণের দুষ্টামীর কথা উঠিলে তিনি বলিতেন, এখনকার ছেলেরা ত সোণার ছেলে, আমরা বাল্যকালে যে প্রকার দুষ্টামী করিয়াছি, এখনকার তোমাদের দুষ্টামী তাহার কাছে ত কিছুই না। যাত্রা শুনিতে আমরা বড়ই ভালবাসিতাম, যাত্রাস্থানে হুঁকা লইয়া শ্রোতাদিগের মধ্যে বড়ই কাড়া-কাড়ি চলিত। হুকা হস্তান্তর হইতে হইতে এতই দূরে চলিয়া যাইত যে, পুনরায় উহা ফিরাইয়া আনা দুরূহ হইয়া উঠিত। আমাদের দলে তাম্রকূটসেবীদিগের সুবিধার জন্য পরামর্শ করিতাম যে, একগাছা লম্বা দড়ি লইয়া এক প্রান্ত হুঁকায় বাঁধিয়া অপর প্রান্ত একজন কেহ ধরিয়া থাকিবে। ঐরূপ করাও হইত। উপস্থিত ঘটনা দেখিয়া কেহ কোন দুরভিসন্ধি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। এইরূপে হুকা লইয়া যখন জনতা অধিক হইত, তখন দড়ির যে প্রান্ত আমাদের নিকট থাকিত, তাহা ধরিয়া এমন সজোরে টান দিতাম যে, কলিকার আগুন ছিটাইয়া পড়িয়া লোকজন হৈ চৈ করিয়া উঠিত। এই অবসরে যাহারা যাত্রা শুনিতে সুবিধামত স্থান পায় নাই, তাহাদের জন্য যথেষ্ট স্থান হইয়া যাইত। কেবল যাত্রা শুনিয়াই আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম না; নিজেরাও বাউল ও যাত্রার দল করিয়াছিলাম। আমাদের যাত্রার দলে সখীসংবাদ অভিনীত হইত। আমি বয়ঃকনিষ্ঠ থাকায় দলের ছোকরা সাজিয়া গান গাইতাম এবং খাতা দেখিয়া বক্তৃতা বলিয়া দিতাম (প্রম্‌টার ছিলাম)। দাদা, রামরক্ষিত

মিত্র, কৃষ্ণপ্রসন্ন গোস্বামী প্রভৃতি জুড়ী সাজিতেন। অটলবিহারী গোস্বামী ও রাজকৃষ্ণ চৌধুরী আমাদের দলে প্রসিদ্ধ বাজিয়ে ছিলেন। নানাস্থান হইতে বহুলোক ইহাঁদের নিকট বাদ্য শিক্ষার জন্য আসিত। আমাদের যাত্রা কেহ ডাকিয়া শুনিতে চাহিত না; কারণ, আমরা একবার যাহাদের বাড়ী যাইতাম, আমাদের দৌরাত্ম্যে তাহাদের পাগল হইয়া যাইতে হইত। পরে, সেইজন্য যখন কেহ ডাকিত না, আমরা নিজেরাই লণ্ঠন জ্বালিয়া সতরঞ্জি ঘাড়ে করিয়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রসহ জোরের সহিত প্রতিবেশীদের বাড়ী যাইয়া যাত্রা গাহিয়া আসিতাম। আমাদের দৌরাত্ম্যের ভয়ে লোকে দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিত; কিন্তু প্রাচীর উল্লঙ্ঘন আমাদের পক্ষে সেরূপ কঠিন কার্য্য ছিল না।"

গোস্বামী মহাশয়ের মধুময় শৈশবচরিত্র সকলকে একান্ত মুগ্ধ করিয়াছিল। সেই অপূর্ব্ব চরিত্রের একদিকে চাঞ্চল্য দৌরাত্ম্য, অপরদিকে সরলতা, কোমলতা ও প্রেম-ভক্তির মধুর মিলন তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রীতিকর করিয়া তুলিয়াছিল। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মনোহর সমাবেশে উহা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। ভগবান্ জগতে উত্তরকালে প্রেম-ভক্তি প্রচারের জন্য এই স্বভাব-শিশুকে অপার্থিব ভক্তিভূষণে ভূষিত করিয়া হরিনাম-মুখরিত পুণ্যভূমি শান্তিপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে গোস্বামী মহাশয় কয়েকবার জীবন-সংশয়কর বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। একবার তাঁহার মাতুলালয়ে শিকারপুরে অবস্থান-কালে জননীর সহিত হাওলার ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। জননী গাত্রমার্জ্জন করিয়া দিবার সময় বালক হস্তচ্যুত হইয়া জলমগ্ন হইয়া যায়। বহুক্ষণ অনুসন্ধান করিয়াও বালককে পাওয়া গেল না। মুহূর্ত্ত-মধ্যে এই দুঃসংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র হওয়ায়, ঘাট লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলের মুখেই হা-হুতাশ! জোয়দ্দার মহাশয় কয়েকজন জালিক

আনয়ন করিলেন। ইতিমধ্যে সকলে বিস্ময়ের সহিত দেখিল, যেখানে বালকের অন্বেষণ হইতেছে, তাহার বিপরীত দিক হইতে জলরাশি ভেদ করিয়া কে যেন বালককে তুলিয়া ধরিল। বালকের মাথায় তখন দীর্ঘকেশ ছিল। জলের উপরিভাগে কেশ পরিদৃষ্ট হওয়ায়, মাতা স্বর্ণময়ী ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বালককে তুলিয়া আনিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বালক বহুক্ষণ জলমগ্ন হইয়া একটুও জল উদরসাৎ করে নাই।

একবার জননী ও অন্যান্য পরিজনসহ তাঁহারা উভয় সহোদর নৌকা-যোগে রঙ্গপুরস্থ শিষ্যালয়ে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে রাত্রি হওয়ায়, ঝাউবনে নৌকা বাঁধিয়া রাত্রি যাপন করিতেছেন। ইতিমধ্যে দস্যুদল-কর্ত্তৃক তাঁহাদের নৌকা আক্রান্ত হয়। সকলেই শেষমুহূর্ত্ত মনে করিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ বালক বিজয় বলিয়া উঠিল "কেও,—দুলাল দাদা!" দস্যুদল চমকিয়া উঠিল। দস্যুসর্দ্দার নৌকা-মধ্য হইতে পরিচিত কণ্ঠে তাহার নাম উচ্চারিত হইতে দেখিয়া নিকটে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিস্ময়বিজড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কেও, দাদা গোস্বামী? এত রাত্রে এখানে নৌকা লাগাইয়াছেন? সঙ্গে কে?—মা ঠাকুরাণী? এখনই ত সর্ব্বনাশ হইত! শ্যামসুন্দর রক্ষা করিয়াছেন।" *

বাল্যকালে এক চোর, অলঙ্কারের লোভে তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া এক জঙ্গলে প্রবেশ করে। কিন্তু বধ করিবার সঙ্কল্প করিবামাত্র তাহার হৃদয় বাৎসল্যরসার্দ্র হইল। নিজকৃত দুষ্কৃতির জন্য তাহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হওয়ায়, সে তাঁহাকে এক পুষ্করিণীর তীরে রাখিয়া চলিয়া যায়।

* এই দুলাল সর্দ্দার গোস্বামী মহাশয়ের প্রজা, জাতিতে জালিক। গোস্বামী মহাশয়কে অত্যন্ত স্নেহ করিত। বাল্যকালে খামারে আসিলে, দুলাল তাঁহাকে সর্ব্বদা ক্রোড়ে পৃষ্ঠে করিত; গোস্বামী মহাশয়ও তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। দুলাল দস্যুদলের দলপতি ছিল। তৎকালে তাহার নাম জানিত না, রঙ্গপুরে এমন লোক বিরল ছিল। গোস্বামী মহাশয়ের রঙ্গপুরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকালে দুলাল বলপূর্ব্বক তাঁহাকে কোলে লইয়াছিল।

গোস্বামী মহাশয় একবার একাকী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে গঙ্গার ধারে চলিয়া গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় রাত্রি হওয়ায়, তিনি পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলেন, এই সময় ৺শ্যামসুন্দর সহসা তথায় বালকমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে বাটীতে লইয়া আসিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলিতেন, "বাল্যকালে কোথাও কোনও বিপদের সম্মুখীন হইলে বাড়ীতে আসিতে না পারিয়া সভয়চিত্তে মাকে ডাকিলে, ভয়ে কাঁদিলে, শ্যামসুন্দর প্রকাশ হইয়া আমাকে রক্ষা করিতেন। কতবার তিনি আমাকে কত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি আমার বাল্যকালের সখা, যৌবনের সহচর ও শেষের একমাত্র আশ্রয়স্থল।" সরলতা, দয়া, করুণাপ্রভৃতি মহাভাবনিচয় যেমন তাঁহার চরিত্রকে কুসুমের কোমলতায় অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল, সত্যবাদিতা ন্যায়ানুরাগ, ধর্ম্মপরতা, নীতিবিগর্হিত কর্ম্মে প্রবল বিতৃষ্ণা, সেইরূপ তাঁহার হৃদয়কে বজ্রাদপি কঠোর করিয়া তুলিয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় এমন একটী সঙ্ঘ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহাদিগের প্রধান কার্য্যই ছিল, অসৎ ব্যক্তিদিগকে দমন করা। অন্যায়কারীরা এজন্য তাঁহাকে অতিশয় ভয় করিত। তাঁহার কোন সহচর একবার মদ্যপান করায়, তিনি এইরূপ ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ঐ ব্যক্তি লজ্জায় দেশত্যাগ করে; বন্ধুগণের প্রতি প্রবল ভালবাসা ও অকৃত্রিম প্রণয়সত্ত্বেও, অন্যায় কার্য্যের প্রতি তাঁহার ঘৃণা এমনই তীব্র ছিল। কেহ কখনও তাঁহাকে একটীও নীতিবিগর্হিত কর্ম্ম করিতে শুনে নাই।





বাল্যসহচরসংবাদ।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন গোস্বামী মহাশয়ের উক্তি ঃ—

"বাল্যকালে আমরা বড়ই দুরন্ত ছিলাম। আমরা শতাধিক বালক দল বাঁধিয়া নানা স্থানে নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইতাম। বিজয় আমাদের সকলের অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিল; কিন্তু সমস্ত কার্য্যে উৎসাহী থাকায়, সে আমাদের দলের অগ্রণী ছিল। কোনও দুষ্টামী করিয়া ধরা পড়িলে আমরা সকলেই মিথ্যা কথা কহিয়া উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু বিজয়ের চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। মিথ্যা কথা বিজয় জানিত না। তাহার সত্যনিষ্ঠার কথা স্মরণ হইলে মনে হয়, সে যেন সত্যযুগের লোক এসেছিল। বাল্যকালে পরের ঘোড়া ধরিয়া তাহাতে চড়া আমাদের খেলার একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। বিজয়দের বাটীর উত্তর-পূর্ব্বাংশে "কুচুইবনে" বর্ত্তমান সময়কার গোঁসাই বাগানে আমরা ঘোড়া ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতাম। অনেক সময়ে পনের দিন, কি একমাস পর্য্যন্তও ঘোড়া লুকাইয়া রাখা হইত, কেহ কোনও সন্ধান পাইত না। একবার মালিপোঁতার জমীদার অম্বিকা বাবুর ঘোড়া লুকাইয়া রাখা হয়। পরে তিনি শুনিলেন যে, গোঁসাই পাড়ার ছেলেরা ঘোড়া ধরিয়া রাখিয়াছে। আমাদের মধ্যে অনেককে এই ঘোড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু আমরা সকলেই লুকাইয়া রাখার কথা অস্বীকার করিলাম। অতঃপর বিজয়কে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন

সে অকুতোভয়ে ও অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া ফেলিল। বিজয়ের মুখের কথায়, ছেলেদের তাঁহার ঘোড়ার উপর লোভ জানিয়া ঘোড়াটী তিনি আমাদের চড়ার জন্য দান করিয়া যান। শ্মশান হইতে শবের খট্টার দড়ি আনিয়া আমরা ঘোড়ার লাগাম প্রস্তুত করিতাম।

এই সময়ে শান্তিপুরের জমীদার মতি বাবুর সহিত প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য চাটুর্য্যেদের নীল ক্ষেত লইয়া ঘোরতর দাঙ্গা হয়। আমরা সেই অনুকরণে সঙ্গীদের লইয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া দাঙ্গা খেলা খেলিতাম। লাঠি, বর্ষা, দা প্রভৃতি অস্ত্র আমরা দাঙ্গায় ব্যবহার করিতাম। কুচুইবনের কালকসিন্দা ও কুচুইগাছ আমাদের নীলক্ষেত্র রূপে ব্যবহার হইত। একদিন খেলিতে খেলিতে আমাদের দলের একজন কাঁসারী বালককে বিজয় এমন ছুরির খোঁচা মারিয়াছিল যে, শরীরের একস্থানে গভীর ক্ষত হইয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকে ;— ভয়ে আমরা সকলেই পালাইলাম। কিন্তু বিজয় অটল অচলভাবে বন্ধুর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে বালকের মাতা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া আমার ছেলেকে "কে খুন করিল—কে খুন করিল" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আহত বালক পাছে বিজয়কৃষ্ণ তিরস্কৃত হয়, এই ভয়ে তাহার নাম করিল না ; কিন্তু সত্যবাদী, নির্ভীক, মধুরপ্রকৃতি বিজয় সমস্ত ঘটনা অকপট হৃদয়ে স্বীকার করিয়া অপরাধীর ন্যায় অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পরে, বিজয়ের মাতা আসিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিলেন এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিয়া মাতা-পুত্রকে বাটী রাখিয়া আসিলেন। এইখানে বিজয় তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। বন্ধুগতপ্রাণ বালক বিজয় প্রতিদিন আহত বন্ধুর জন্য ৺শ্যামসুন্দরের প্রসাদ দিয়া আসিতেন ও তত্ত্বাবধান করিতেন।

কালনার ঝুলন দেখিবার সখ আমাদের বড়ই প্রবল ছিল। রাত্রিকালে আমরা ঘাট হইতে মাঝিদের নৌকা খুলিয়া লইয়া যাইতাম

এবং পাছে ধরা পড়ি, এই ভয়ে প্রত্যুষের পূর্ব্বেই যথাস্থলে নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়া স্ব স্ব আলয়ে ফিরিয়া আসিতাম। দৈব-দুর্য্যোগে একদিন কালনায় নৌকা পৌছিলে পর, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। গভীর মেঘ-গর্জ্জন ও বিদ্যুতের ঝলকে আমরা সকলেই ভীত হইলাম। এই অবস্থায় নৌকা লইয়া শান্তিপুরের ঘাটে ফিরিতে আমাদের সাহস হইল না। সারারাত্রি বর্ষণের পর প্রাতে আকাশ পরিষ্কার হইলে মাঝির ভয়ে আমরা নৌকায় আসিতে সাহস করিলাম না। কুপন খেলায় আমাদের সকলের পয়সা ফুরাইয়া গিয়াছিল, হাতে পয়সা না থাকায়, খেয়া পার হইয়া ততগুলি লোকের শান্তিপুরে আসাও কষ্টকর হইয়া উঠিল। বিজয় খেয়াঘাটে আসিয়া, নিজের সমস্ত রাত্রি অনাহার ও পয়সার অভাব মাঝিদের মিষ্টকথায় জানাইয়া তাহাদের দয়া উদ্রিক্ত করিল। তাহারা আমাদিগকে বিনা পারানিতে পার করিয়া দিতে সম্মত হইল। বিজয়ের বাক্যে মনোমোহিনী-শক্তি ছিল, সে শক্তি সব মানুষের হয় না। শুষ্কহৃদয় মাঝি, বিজয়ের কথায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আমাদিগকে পার করিয়া দিল। আমরা সকলে পার হইয়া বাটীতে চলিয়া আসিলাম। বাটী পৌছিয়া দেখি, নৌকা হারাণ লইয়া তুমুল আন্দোলন হইতেছে। মাঝিরা ইতস্ততঃ স্থানচ্যুত নৌকার সন্ধান লইতেছে। ভয়ে আমরা বাটীর ভিতর লুকাইয়া রহিলাম; কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ পরদুঃখকাতর বিজয় মাতার নিকট আদ্যোপান্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। মাঝিদের কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতক্ষণ মাঝিদের নৌকার সংবাদ প্রদত্ত না হয়, ততক্ষণ আমি আহার করিব না। শেষে নিজেই মাঝিদিগের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মাঝিরা গাল-মন্দ দিবে, এমন কি, প্রহার করিতে পারে এই চিন্তা করিয়া মাতা বিজয়কে নিষেধ করিলেন। কিন্তু মাতার শত নিষেধেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিজয় যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিলেন, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলেন না। মাতাও শেষে

নিরুপায় দেখিয়া পুত্রকে কিছু পয়সা দিয়া বলিলেন,—"যা এই পয়সা দিয়ে মিটিয়ে আয়।" বিজয় মাতৃদত্ত অর্থসহ মাঝিদের নিকট গমন করিয়া স্বভাবসুলভ মধুরভাষায় কাতরহৃদয়ে নিজেদের দোষ স্বীকার করিয়া ঐ অর্থ প্রদান করিলেন। মাঝিরা প্রথমে রুষ্ট হইল, শেষে বালকের হৃদয়মোহনকারী রূপ, গুণ ও মধুরবাক্যে বিমোহিত হইয়া স্বভাবদোষ বিস্মৃত হইল।

শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী সুতরাগড়প্রভৃতি পল্লীগ্রাম হইতে গোয়ালিনীরা প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছানা লইয়া গোস্বামী মহাশয়দের বাটীর পূর্ব্বপার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়া ময়রার দোকানে বিক্রয় করিতে যাইত। আমরা সকলে মিলিত হইয়া পথে গর্ত্তখননপূর্ব্বক সেই গর্ত্তের উপরিভাগ ঝাঁটার কাঠি ও কলার পাতা দ্বারা ঢাকিয়া তদুপরিভাগ ধূলিদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতাম। সন্ধ্যার সময় ছানার হাঁড়ি মস্তকে লইয়া যখন গোয়ালিনীরা ঐ পথ অতিক্রম করিত, তখন তাহাদিগের পা আমাদিগের প্রস্তুত গর্ত্তে পড়ায়, হাঁড়িসহ পড়িয়া যাইত।

কোন কোন দিন একটি লম্বা দড়ি পথের উপর আড়া-আড়ি ফেলিয়া দুইজনে দুই প্রান্ত ধরিয়া এমনভাবে বসিয়া থাকিতাম যে, কেহ আমাদের দুরভিসন্ধি কল্পনাতেও আনিতে পারিত না। গোয়ালিনীরা নিকটবর্ত্তী হইলে আমরা দড়ি ধরিয়া টানিতাম; তাহার ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া হাঁড়ি সমেত তাহারা পড়িয়া যাইত। আমরা অন্ধকারে সেই ছানা লইয়া পলাইয়া গিয়া কুচুইবনে বসিয়া মনের সুখে আহার করিতাম। কখন কখন ছদ্মবেশে দ্বিতীয় সুযোগের অপেক্ষায় পথিমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতাম। বিজয় এই সমস্ত কার্য্যের মন্ত্রণাদাতা ও উদ্যোগী ছিল; কিন্তু নিরূপায় গোয়ালিনীরা যখন দুঃখের সহিত কাঁদিত, তখন বিজয় আর স্থির থাকিতে পারিত না। তাহাদিগকে কাঁদিতে দেখিয়া নিজেও প্রায়ই কাঁদিয়া ফেলিত এবং মাতার নিকট হইতে পয়সা আনিয়া ক্ষতি-

পূরণ করিয়া বিদায় দিত। তাহার হৃদয় যে কি স্বর্গীয়ভাবে মণ্ডিত ছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আমরা পঙ্গপালের ন্যায় মাঠে মটরশুঁটির অতিমাত্র লালসায় শুভাগমন করিতাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বড় অধিকক্ষণ নিরুদ্বেগে "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞ" এই নীতিবাক্য অক্ষরে [illegible] প্রতিপালন করিতে অবসর ঘটিত না। অনতিবিলম্বে লগুড়হস্তে ক্ষেত্ররক্ষক কিছু মধুররসাত্মক সম্বন্ধ আরোপ করিয়া আমাদের অনুধাবন করিত। অগত্যা আমরা তাহার মাথায় আশু বজ্রপাতের প্রার্থনা করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতাম। ক্রমে ঐ রসাত্মক শব্দের দুরূহ প্রতিধ্বনিতে পিতৃপুরুষ পর্য্যন্ত ব্যস্ত হওয়ায়, ঐ স্থানে পুনরায় গমন করার প্রবৃত্তি আমাদের ক্রমশঃই মন্দীভূত হইয়া যায়।

সমবয়স্কদিগের সহিত গ্রামপ্রান্তে মাঠে উপস্থিত হইয়া আমরা প্রায়ই বনভোজন করিতাম। ঘোড়ালের মাঠে এবং নির্ঝরের ধারে দেবী রায়ের আম্রকাননে আমাদের বনভোজনের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। রন্ধনকার্য্যে বিজয় অতি সুপটু ছিল। তাহার হাতের পাক অমৃতের ন্যায় সুমধুর লাগিত। সুতরাং রন্ধনকার্য্য সেইই সম্পন্ন করিত। কোন কোনও দিবস, ব্রজগোপালও পাক করিতেন। আমাদের বনভোজন একটী বৃহৎ ভোজের ন্যায় সমারোহ হইত। রন্ধনান্তে দীনবৎসল বিজয় নিকটবর্ত্তী রাখাল ও কৃষকবালকগণকে ডাকিয়া আনিত। রথডাঙ্গার পাড়া হইতে মুচীদের পুত্র-কন্যাগণও আসিয়া যোগ দিত। ভেড়ীপাড়ার বালকেরাও আমাদের এই আনন্দ-ভোজনে বঞ্চিত হইত না। বর্ত্তমান সময়ের বিলাস-গর্ব্বিত উদ্ধত বাঙ্গালী যুবকের ন্যায় তখন আমাদের মানাপমানের তৌল তত হাল্‌কা ছিল না। সুতরাং তাহাদিগকে লইয়া একত্রে ক্রীড়া করিতে আমরা বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করিতাম না। আহারান্তে গোষ্ঠলীলা হইত। সমবয়স্কদিগের মধ্যে কেহ শ্রীদাম, কেহ সুদাম, কেহ অনুদাম সাজিত; বিজয়েরা উভয়

সহোদর কৃষ্ণ বলরাম সাজিয়া গোচারণ করিতেন। আমার বেশ মনে আছে, বিজয়কে কোমল-তৃণগুচ্ছ লইয়া ধেনুগণকে আহার দিতে দেখিয়াছি। অঞ্চলে মুড়ি লইয়া রাখাল-বালকগণের সহিত ধেনুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতাম। বিজয়ের কাঁধে উঠিয়া কতই বেড়াইয়াছি; এখনকার মত হিংসা, বিদ্বেষ তখন [illegible]র মনে স্থান পাইত না।

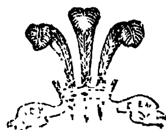
আমাদের মধ্যে রামযাদু বৈষ্ণব নামে এক ছোকরা থাকিত। বিজয় তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাহার মা ভিক্ষার দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করিত, তদ্দ্বারাই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। মাতা রামযাদুকে প্রায় ভিক্ষায় পাঠাইত, কিন্তু পাছে উদরান্নসংস্থানের জন্য প্রেমাস্পদকে অন্যত্র যাইতে হয়, এজন্য বিজয় বাড়ী হইতে বস্ত্রপ্রান্তে করিয়া তাহাকে চাউল আনিয়া দিত। কখন কখনও পরিধেয় বস্ত্র, গাত্রাবরণের জন্য পিরাণ, দোলাই প্রভৃতিও আনিয়া দিত। তখন জুতার তত রেওয়াজ (প্রচলন) ছিল না।

আমাদের শৈশবকালে শান্তিপুরের স্থানে স্থানে প্রায়ই রামায়ণ কথকতা হইত। তারণ গোস্বামী মহাশয় তখন কথকতা করিতেন। আমরা কথকতা শুনিতে বড়ই ভালবাসিতাম। কথক ঠাকুরের জন্য বিজয় স্বহস্তে মালা গাঁথিয়া লইয়া যাইত। ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে বিজয় প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইত। অশ্রুধারায় তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। সেই অনির্ব্বচনীয় ভাব অন্যকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। কথক ঠাকুর বলিতেন,—"এই বালকের প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে!"

শান্তিপুরে লছমনদাস নামে তখন একজন বৈষ্ণব সাধু গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। সাধুর নামানুযায়ী তাঁহার আশ্রমসমীপস্থ ঘাটকে 'লছমন ঘাট' বলিত। বাবাজীর একখানি ক্ষুদ্র কুটীর ছিল। তাহার দৃশ্য-শোভা

বড়ই সুন্দর ছিল। কুটীরখানির চারিদিক অশ্বত্থবৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় সমাচ্ছন্ন থাকায় উহা ক্ষুদ্র বিহঙ্গনীড়ের ন্যায় স্নিগ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইত। মুক্ত-প্রকৃতি, যেন তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য্য দিয়া কুটীরখানিকে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্মুখে ভাগিরথী গঙ্গা, তাঁর নির্ম্মল জলরাশি বুকে লইয়া নাচিতে নাচিতে বহিয়া যাইতেন, আর আমরা তরঙ্গ-কল্লোলিত তটভূমির উপর বসিয়া সূর্য্যাস্তের অনুপম শোভা নিরীক্ষণ করিতাম।

বিজয় লছমন ঘাটে যাইয়া বাবাজীর গান শুনিতে বড়ই ভালবাসিত। আমরা তাহাকে কৌশলে অন্যপথ দিয়া বেড়াতে লইয়া যাইতাম। বিজয়-বাবাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া যখন তাঁহার সুললিত-কণ্ঠ-নিঃসৃত দোঁহাবলীর পাঠ শুনিত, তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঢুলিতে থাকিত, নয়নদ্বয়ে দরদরিত ধারা বহিত। কিছুতেই উঠিতে চাহিত না। বাবাজী বলিতেন,—'বিজয়ের অবস্থা বড়ই মনোহর, হৃদয় প্রেমরসে পূর্ণ'; আমরা উঠিবার জন্য ক্রমাগতই 'উসি-কিসি' করিতাম। তাহাতেও যখন কৃতকার্য্য হইতাম না; তখন 'ওরে বিজয়ের ভাব লেগেছে,—ভাব লেগেছে!' বলিয়া হাত পা ধরিয়া কাঁধে করিয়া লইয়া আসিতাম। রামলাল বাবাজী বিজয়কে দেখিলে বলিতেন,—'ইঁনি মহাপুরুষ, এখনই ইঁহার নির্ম্মল ভক্তি লাভ হইয়াছে!' কথা শুনিয়া বিজয় হাসিয়া পলাইত, কখন কখনও বাবাজীর কড়োয়া কাড়িয়া লইত।"

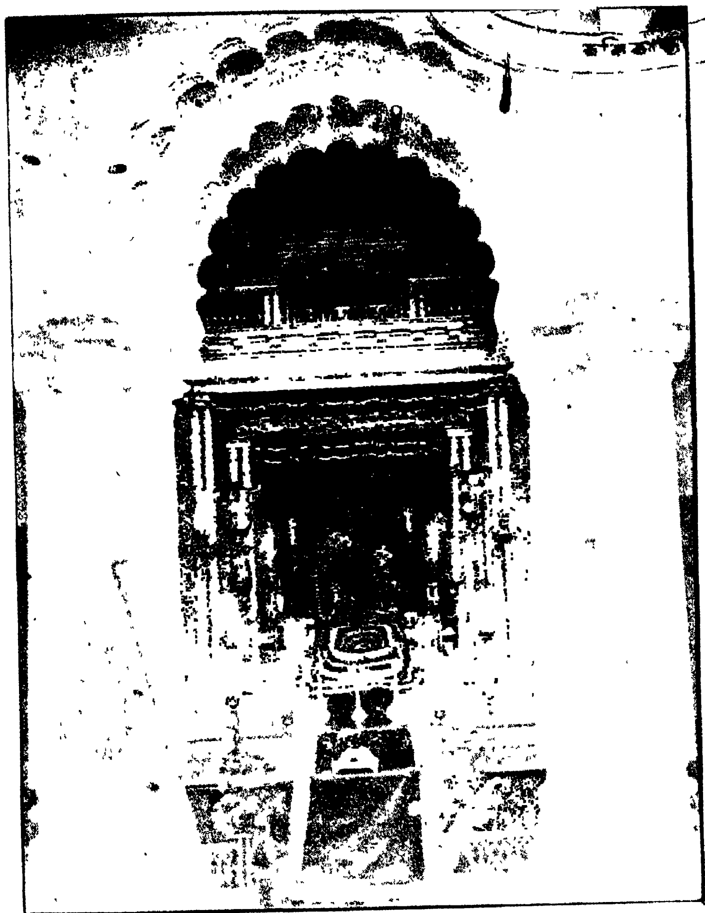




সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত রামরক্ষিত মিত্র মহাশয়ের কথা।

"অতি শৈশবে বিজয় ও আমার একদিনেই ভগবান গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় হাতে-খড়ি হয়। ভগবান গুরুমহাশয় জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। বর্ত্তমান শ্যামাচাঁদুনির প্রাঙ্গণে তাঁহার পাঠশালা বসিত। আমাদের বৃক্ষতলে মাদুরে বসিয়া লেখাপড়া করিতে হইত। তৎকালে শ্যামাচাঁদুনির ঘর এরূপ বৃহৎ ছিল না, মাত্র একটী ছোট কুঠুরী ছিল। বৃষ্টি আসিলে উক্ত কুঠুরীতে অতি কষ্টে ঠেলা-ঠেলি করিয়া পড়ুয়াগণকে আশ্রয় লইতে হইত। ঐ কুঠুরীর পার্শ্বস্থ একটী ভগ্ন কুটীরের জরাজীর্ণ মেঝের উপর আমরা বড় বড় অক্ষরে দাগা বুলাইতাম। তখন আমাদের গুরুমহাশকে যমরাজের দ্বিতীয় সংস্করণ ব্যতীত অন্য একটা কিছু বলিয়া মনে হইত না। গুরুমহাশয়ের আকৃতি লম্বা, শরীর কৃশ ও বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ ছিল। গুরুমহাশয়ের সম্মুখে আমরা বলিপ্রদানের জন্য আনীত ছাগ-শিশুর ন্যায় থাকিতাম। তাঁহার প্রতি অহৈতুকী ভক্তির উচ্ছ্বাসে পড়ুয়াগণের চক্ষু প্রায় সকল সময়েই অশ্রুপূর্ণ থাকিত। রাগ হইলে গুরুমহাশয় আমাদিগকে নাড়ুগোপাল সাজাইয়া হাতে পায়ে ইষ্টক দিয়া অলঙ্কৃত করিয়া রাখিতেন। কখন কখনও হাত পা বাঁধিয়া পিপীলিকার গাদায় বসাইয়া দিতেন। অতীতকালের পাঠশালার বিভীষিকাময়ী স্মৃতিতে আমাদের হৃদয় এখনও প্রকম্পিত হয়।

আমাদের গুরুমহাশয় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। পরোপকার,



শ্রীরাসোৎসবে ৺শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ।

Girish Printing Works.

ভগবদ্ভক্তিপ্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী দ্বারা তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণে ভক্তি অতীব বলবতী ছিল। কোন ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে সমারোহ হইলে গুরুমহাশয় বিনা আহ্বানে তথায় উপস্থিত হইয়া হাট-বাজার হইতে বাড়ী পরিষ্কার, উচ্ছিষ্টমার্জ্জনাপর্য্যন্ত ছোট বড় সমুদয় কর্ম্ম ভক্তির সহিত সম্পাদন করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার কোনও রূপ অভিমান ছিল না। ব্রাহ্মণভোজনান্তে তাঁহাদের প্রসাদব্যতীত অন্য দ্রব্য আহার করিতেন না। কর্ম্ম-কর্ত্তা অথবা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কেহ গৃহ হইতে উৎকৃষ্ট সামগ্রী আনিয়া তাঁহাকে আহার জন্য আহ্বান করিলে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইতেন। এমন কি, ভোজন না করিয়াই চলিয়া যাইতেন। একবার তিনি আহারে বসিলে, এক ব্যক্তি চারিখানা মৎস্য লইয়া তাঁহার পাতে দেয়, ইহাতে গুরুমহাশয় সমস্ত আহারীয় বস্তু ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কেহ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারায়, অবশেষে বিজয় তাঁহাকে হাত ধরিয়া লইয়া আসেন। বাস্তবিক, বিজয়ের কমনীয় মূর্ত্তি দেখিলে ক্রোধীরও ক্রোধ ভঙ্গ হইয়া যাইত। তাঁহার স্নেহপূর্ণ কোমল স্বরে যে অমৃতধারা নিঃসৃত হইত, তাহা অনির্ব্বচনীয়। এই গুরুমহাশয়ের অত্যাশ্চর্য্য মৃত্যু আমাদের চক্ষের সম্মুখে ঘটিয়াছিল। তাহার বিবরণ তৎকালে দেশে-বিদেশে প্রতিধ্বনিত হইত ;—এখনও অনেকে তাহার গল্প করিয়া থাকেন। একদিন পাঠশালায় আমরা দাগা বুলাইতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠিল। গুরু-মহাশয়ের আহ্বানে আমরা তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর আশ্রয় লইলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে অতিশয় শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। মনে আছে, সেদিন খুব বড় বড় শিলাপাত হইয়াছিল। এই সময় গুরুমহাশয় বয়ঃস্থ পড়ুয়াদের আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"দেখ, আজ বড় আমার পা জ্বালা করিতেছে। তোমরা খানকয়েক শিলা লইয়া আইস।" আজ্ঞামাত্র শিলা স্তূপীকৃত হইল। তিনি উহা হইতে কতকগুলি একত্র করিয়া তাহার উপর

পদভাগ স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিলেন। ইহাই তাঁহার পীড়ার প্রথম ও শেষ লক্ষণ। পরদিন তিনি ছাত্রগণসমভিব্যাহারে গঙ্গাস্নানে গমন করিয়া স্নানকরণানন্তর যথাবিধি তিলক অনুলেপন করিয়া গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন।

গুরুমহাশয়ের মৃত্যু হইলে আমরা কিছুদিন হেজেল সাহেবের বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলাম; বিজয়কৃষ্ণ ও ব্রজগোপাল উভয় সহোদরই এই বিদ্যালয়ে সংস্কৃতবিভাগে পাঠ করিতেন। প্রায় বিশজন অধ্যাপক এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ভাটপাড়ানিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদীশ ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত পড়াইতেন। শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইংরাজীশিক্ষা প্রদান করিতেন। এতদ্ব্যতীত শান্তিপুরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য, রামেশ্বর লাহিড়ী, রাধু মাষ্টার, উমাচরণ মুখোপাধ্যায়, দীননাথ ভাট্টাচার্য্য, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য ও কালাচাঁদ কর প্রভৃতি শিক্ষকগণ শিক্ষাদানকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে এই বিদ্যালয় পরিচালিত হইত। এই সময় বমেশ সাহেব শান্তিপুরে আর একটী স্কুল স্থাপন করায়, হেজেল সাহেবের স্কুলটী উঠিয়া যায়। বমেশ সাহেবের প্রতিষ্ঠাপিত বিদ্যালয়ে অনেক খৃষ্টান প্রতিপালিত হইত।

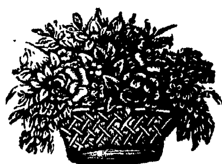
পাড়ায় আমরা শতাধিক বালক ছিলাম। বিজয়ের বাটী, আন্না ঠাকুরাণীর বাগান, মধু ভট্টাচার্য্যের বাটীর প্রাঙ্গণ, সিংহদিগের বাটীর বহির্ভাগ, শ্যামাচাঁদনীতলা প্রভৃতি স্থানে আমাদের খেলিবার আড্ডা ছিল। আমরা ঘোড়ানুটী, দাণ্ডাগুলি, নক্সো প্রভৃতি খেলিতাম। বিজয়ের দ্বিতলগৃহে কোজাগরী পূর্ণিমার দিনও সারারাত্রি খেলা হইত। বিজয়ের জননীর মহান্ চরিত্রের কথা, আর কি বলিব! তিনি পুত্রকে যে চক্ষে দেখিতেন, আমাদেরও সেই চক্ষে দেখিতেন। কত আদর করিয়া আমাদের আহার করাইতেন। তাঁহার স্নেহ কখনও ভুলিতে পারিব না।

বাল্যকালে আমরা বড়ই দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইতাম। ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতাম। প্রায়ই ঘোড়া চুরি করিয়া আনা হইত। 'পেসা ধোপা' আমাদের অশ্ব অপহরণ করিয়া আনিবার সর্দ্দার ছিল। তাহার সঙ্গে বিজয়, হারাণ ও গোলোক উৎসাহী থাকায় সোনায় সোহাগা মিশিয়াছিল। শান্তিপুরের তথনকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ঈশ্বর বাবুর ঘোড়ায় চড়িতে বিজয়ের বলবতী ইচ্ছা হওয়ায়, একদিন সায়ংকালে আমরা সকলে সহচর বালকগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার অশ্বশালা হইতে ঘোড়া লইয়া চড়িয়াছিলাম। অশ্বরক্ষক অসময়ে অশ্বের পদশব্দ ও পরিচিত হ্রেষারব শুনিয়া আগমন করিল এবং সমস্ত অবগত হইয়া আমাদিগকে ধরিতে আসিল। আমরা সকলেই পলায়ন করিলাম। প্রসন্ন, ঘোড়ার লাগাম বাঁধিতেছিল, পলাইতে না পারায় নিকটবর্ত্তী এক কূপের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল, বিজয় ঘোড়ার উপরে ছিলেন; সুতরাং অনায়াসেই ধৃত হইলেন এবং নির্ভীকচিত্তে অশ্বরক্ষকের সহিত ডেপুটী বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ডেপুটী বাবু প্রশ্ন করিলেন,—'তোমরা আমার অশ্ব লইয়াছিলে?' বিজয় স্বীকার করিল। ডেপুটী বাবু পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন.—'আমার অজ্ঞাতসারে কেন এরূপ করিলে?' তাহাতে বিজয় বলিল,—'আমাদের ঘোড়ায় চড়িবার অত্যন্ত সখ হইয়াছিল, চাহিলে চড়িতে পাইতাম না জানিয়াই, এইরূপ করা গিয়াছে।' বালকের স্বীকার উক্তিতে সাহস, সত্যবাদিতা ও সরল-স্বভাবের পরিচয় পাইয়া ঈশ্বরবাবু নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তখন হইতে যথনই আমাদের অশ্বারোহণের প্রয়োজন হইত, তখন ঈশ্বর বাবুর অভিপ্রায় অনুসারে অশ্বরক্ষক জিন ও লাগাম দ্বারা অশ্ব সাজাইয়া দিত, আমরা আনন্দে অশ্বারোহণ করিতাম।

এই সময়ে শান্তিপুরে এখনকার অপেক্ষা অধিকতর সমারোহের সহিত

ধূলট্ মহোৎসব সম্পন্ন হইত। দেখাদেখি বিজয় বলিলেন, আমরা এক-মাসব্যাপী ধূলট্ করিব। আজ্ঞামাত্র ধূলট আরম্ভ হইল। আমাদের ধূলটে এতই ধূলি নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রীড়া হইত যে একমাস পর্য্যন্ত আমাদের পাড়ার রাস্তাগুলিতে একরূপ লোক চলাচল স্থগিত ছিল। পরে ঈশ্বর বাবুর কর্ণ-গোচর হইল যে, গোঁসাইপাড়ার ছেলেদের ধূলাখেলার প্রভাবে ঐ পাড়ার রাস্তাগুলি জনপ্রাণিহীন হইয়া পড়িয়াছে। তৎকালে রথের সরাণের নিকট ফাঁড়িঘর ছিল। ঈশ্বর বাবু তখন কনষ্টেবল্‌দের হুকুম দেন যে, তোমরা দূর হইতে ছেলেদিগকে তাড়াইয়া দিবে; সকলেই ভদ্রসন্তান, দেখিও যেন কোনও অত্যাচার না হয়। পাহারাওয়ালারা তৎকালে বালাগস্তী নামে অভিহিত হইত। ইহাদের ক্রমাগত আট দশ দিনের বিশেষ চেষ্টায়, আমাদের সখের ধূলট ভাঙ্গিয়া যায়।

আমরা বাল্যকালে সঙ্গিগণসহ পাড়ায় পাড়ায় 'হোল্‌বোল্' গাহিয়া বেড়াইতাম এবং প্রতিবেশিগণের বাটী হইতে প্রচুর চাউল সংগ্রহ করিয়া মহোৎসব করিতাম। রন্ধনকার্য্যটী বিজয়ের একচেটিয়া থাকায়, সেদিকে কাহাকেও ঘেঁসিতে হইত না। কৃপণ ব্যক্তিদিগকে উৎপীড়িত করিবার অভিপ্রায়ে আমরা তাহাদিগের বাড়ীতে কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি প্রতিমা রাত্রিকালে রাখিয়া আসিতাম; সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে ঐ সকল দেবী-মূর্ত্তির পূজা করিতে হইত এবং আমরাও এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া মহানন্দে মিষ্টান্নাদির সদ্গতি করিয়া আসিতাম। এইরূপ করিয়া মাঝে মাঝে আমরা বেশ স্ফূর্ত্তি পাইতাম।





সঙ্গী শ্রীযুক্ত গোলোককিশোর গোস্বামী মহাশয়ের কথা।

বিজয়ের মধুর শৈশবপ্রকৃতি আমাদের সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। আমরা তাঁহাকে সকলেই অত্যন্ত ভাল বাসিতাম। বিজয়ের কাছে না আসিলে, বিজয়ের কাছে না বসিলে, আমাদের মন বড়ই ব্যাকুল হইত। বিজয়ের ধীরতা, বিজয়ের স্নেহালাপ, বিজয়ের মৃদুমধুর বিচিত্রভাব দেখিয়া কেহই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। ধর্ম্মের নাম শুনিলেই তাঁহার শিশুহৃদয় নাচিয়া উঠিত। শান্তিপুরের প্রচলিত পর্ব্বগুলির প্রায় প্রত্যেকটীর আমরা অনুকরণ করিতাম। আমরা চড়কপূজা করিতাম, যথারীতি আমাদের গাজন বসিত। আমরা গৈরিক বসনাবৃত হইয়া সন্ন্যাসী সাজিতাম। বিজয় মূল সন্ন্যাসী হইতেন। সন্ন্যাসীদিগকে উপবাসী থাকিতে হয়, আমরাও জঠরানলে অন্ন-ব্যঞ্জনের পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণমাত্রায় উপবাস করিতাম সন্দেহ নাই। আমরা বিধিমত কাঁটা ভাঙ্গিতাম। শিয়ালকাঁটার গাছ বিছাইয়া তাহার উপর গড়াগড়ি দিতে হইত। এই সময়ে সকলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত, আমাদের গভীর উৎসাহ যেন কিছু মন্দভাব ধারণ করিত। তৎকালে মহাদেবের বিশ্বস্ত অনুচরের ন্যায় সমস্বরে তাঁহার নামের দোহাই

পাড়িতাম। দুঃখের বিষয়, ইহাতেও বিরূপাক্ষের বিশেষ দয়ার উদ্রেক হইতে দেখিতাম না, কারণ তখনও কাঁটার তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র হ্রাস হইত না। অনন্তর আমাদের 'আগুনসন্ন্যাস' হইত। শ্মশান হইতে মড়ার মাথা আনিয়া অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে উহা লইয়া ক্রীড়া করিতাম। অগ্নিক্রীড়া শেষ করিয়া সকলে মিলিয়া একত্রে শিবপূজা করিতাম। বিজয় নিজহস্তে শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন। এই মূর্ত্তির গঠনকার্য্য ও অনুলেপ এতই নির্দ্দোষ হইত যে, সমীপস্থ দর্শকবৃন্দ কোনও দেবালয় হইতে লিঙ্গমূর্ত্তি আনয়ন করিয়াছি ভ্রমে আমাদিগকে তিরস্কার করিতেন। পরে বিজয়ের স্বহস্তনির্ম্মিত অবগত হইয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের অবধি থাকিত না। এই মৃন্ময় শিবলিঙ্গের মস্তকে বিল্বদল চাপাইয়া আমরা দেবানুকম্পায় প্রসাদীপত্র পাইবার আশায় অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে সমস্বরে প্রার্থনা করিতাম। প্রার্থনা পূরণ হইতে বড় অধিক বিলম্ব হইত না। অনতিদীর্ঘ ফুৎকার ও দুগ্ধমিশ্রিত গঙ্গাজলধারা আমাদের অভীষ্টপূরণপথে সহায়স্বরূপ ছিল। সরলহৃদয় বিজয় এই সকল বড় বুঝিতে পারিত না। সে আত্মবিস্মৃত হইয়া অবিরত প্রার্থনা করিতে থাকিত এবং বিল্বপত্র পতিত হইলে, তাহা মস্তকে ধারণ করিয়া অবিরল আনন্দাশ্রু মোচন করিত। সমবেত জনতা বিজয়ের এই মহান্ ভাব নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। দর্শকবৃন্দের আগ্রহ ও ঔৎসুক্যপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি বিজয়ের দেবোপম পবিত্র মুখখানির উপর পতিত হইয়া সেই স্বর্গীয় দৃশ্যকে অধিকতর সুন্দর করিয়া তুলিত। মধুময় শৈশবের সেই আনন্দ-ছবি এখনও হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা বাঁশের চড়কগাছ নির্ম্মাণ করিয়া পাক খাইতাম। চড়কের সময়ে আমাদের দৌরাত্ম্য-প্রপীড়িত প্রতিবেশিগণকে সদা সশঙ্ক থাকিতে হইত, কারণ আমাদিগের চঞ্চল হস্ত চড়কগাছের দোলনপাক নির্ম্মাণের জন্য প্রতিবেশিগণের কূপতট হইতে দড়ি অপহরণ করিতে কিছুমাত্র ভীত বা লজ্জিত হইত না। অনেক

সময়ে ধৃত হইতাম বটে, তথাপি আমাদের স্বকার্য্যসাধনের যে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিত, এরূপ স্মরণ হয় না।

বিজয়ের স্নেহ-কোমল-হৃদয়ে আর্ত্তজনের জন্য করুণার উৎস সদাই প্রবাহিত হইত। তাঁহার সুকোমল হৃদয়স্থিত সকরুণ স্নেহ, রোগশোক-ক্লিষ্টকে সহানুভূতি দান করিতে, বিপন্নজনকে বিপন্মুক্ত করিতে স্বতঃই উৎসাহিত থাকিত। সেই পুণ্যময়ের পবিত্র প্রভাত-জীবনের কথা অদ্যাপি স্মরণপথে উদিত হইলে পাপভারাক্রান্ত, সংসারক্লিষ্ট মলিনজীবন এখনও যেন উজ্জ্বল ও পবিত্র হইয়া উঠে।

বৈশাখ মাসে পথিকদিগের জন্য শান্তিপুরের নানাস্থানে পথিমধ্যে জলসত্র দেওয়া হইত। করুণার প্রতিমূর্ত্তি বিজয় মধ্যাহ্নকালে ঐ সকল সত্রে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে পথিকদিগকে পিপাসার বারি প্রদান করিত। একা তাঁহাকে সমস্ত পুণ্যটুক অধিকার করিতে দেখিয়া আমাদের সরল শিশুহৃদয়ে পুণ্য-অর্জ্জনের স্পৃহা অধিকতর বলবতী হইয়া উঠিত, সুতরাং ঠাকুরমার বহুদিন সঞ্চিত ও সযত্নরক্ষিত সন্দেশ ভাণ্ডমধ্য হইতে গোপনে লইয়া তৃষিত পান্থদিগকে প্রদান করিতাম। ঠাকুরমার সাধের সন্দেশে কিন্তু তাহাদের বিশেষ তৃপ্তির লক্ষণ দেখিতাম না, কারণ ঐ সকল সন্দেশের জন্মদিন নিরূপণ করা প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের পক্ষেও একান্ত অসাধ্য ছিল।

মধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ডতাপে পথে বাহির হওয়া যখন একান্ত দুঃসাধ্য ছিল, পাছে আমরা সেই সময় বাহির হই, এই জন্য জননী আমাদিগকে, তাঁহার কোলের কাছে লইয়া ঘুম পাড়াইতেন। আমরা কৃত্রিম নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া থাকিতাম। জননী দুই একবার আমরা ঘুমাইয়াছি কিনা, দেখিবার জন্য আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন। ক্রমে তাঁহার ক্লান্ত শরীরটী নিদ্রাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলে আমরা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া বিজয়ের বাটীতে সম্মিলিত হইতাম ও তাহাকে লইয়া

গ্রামস্থ বাগান হইতে আম জাম পাড়িতে যাইতাম, ফিরিয়া আসিয়া বিজয়ের বাটীতেই আমরা আমের চাট্‌নি তৈয়ার করিতাম। আমাদের প্রস্তুত চাট্‌নি এমন সুস্বাদু হইত যে, সে কথা মনে হইলে এখনও জিহ্বা সজল হইয়া উঠে। এখানেও আমাদের পরিত্রাণ ছিল না, বিজয়ের মাতার চক্ষে পড়িলে, আর আমরা বাহির হইতে পারিতাম না। মা যেমন ছোট শিশুদের মিষ্ট গল্পে ভুলাইয়া তাহাদিগকে ধীরে ধীরে ঘুম পাড়ান, তিনিও তেমনি আমাদিগকে আদরের সহিত নিকটে বসাইয়া "ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী" "দুয়োরাণী-সুয়োরাণী" "রাক্ষস-রাক্ষসী" প্রভৃতির উপকথা বলিতেন। একমনে তাঁহার সেই অদ্ভুত উপকথা শুনিতে শুনিতে আমাদের চক্ষু ঢুলিয়া পড়িত ;—অজ্ঞাতসারে "হুঁ" দেওয়া বন্ধ হইয়া যাইত। তিনিও সুযোগ বুঝিয়া আমাদিগকে বাতাস করিতে করিতে নিদ্রামগ্ন করিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইতেন। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের সেই দীর্ঘ দিনের অবসানে আমরা ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতাম এবং বিজয়ের মাতার সযত্নরক্ষিত বৈকালিক শীতল প্রসাদ গ্রহণ করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতাম। এমন সময়ে বিজয়দের বাটীতে শ্যামসুন্দরের সন্ধ্যা আরতি বাজিয়া উঠিত আমরা মন্দিরপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতাম। আরতি যখন শেষ হইত, তখন সকলে একসঙ্গে, হরিধ্বনি দিয়া ভক্তিভাবে শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করিতাম।

বিজয়ের শিশুজীবনের মধুর স্মৃতি আমাদের প্রাণে তাঁহার প্রতি অটল শ্রদ্ধার ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার চরিত্র মানবের ক্ষুদ্রতা ও অপূর্ণতার অনেক ঊর্দ্ধে বিরাজ করিত। কথাপ্রসঙ্গে একটা অনেকদিনের পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল। এক সময়ে গঙ্গাস্নানোপলক্ষে শান্তিপুরে বহুযাত্রীর সমাগম হয়। সমাগত যাত্রীদের মধ্যে একটী বালক বিসূচিকারোগগ্রস্ত হওয়ায়, সহযাত্রিগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। পীড়িত বালকের মাতা আশ্রয়হীন

অবস্থায় পথিপার্শ্বে মৃত্যুকবলগ্রস্ত সন্তানকে লইয়া কাঁদিতেছিলেন। রোগযন্ত্রণায় বালক ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। তাহার পিপাসায় জল প্রদান করে, অথবা তাহার দিকে চাহিয়া 'আহা' বলে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। বিজয় এই করুণদৃশ্য দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তাড়াতাড়ি গ্রাম হইতে শিবিকা লইয়া সেই বালককে আমাদিগের নাট্যমন্দিরে আনয়ন করিলেন। কয়েকদিন যাবৎ অবিরত শুশ্রূষা ও যথারীতি ঔষধাদির ব্যবস্থা হওয়াতে বালক রোগমুক্ত হইয়া উঠিল। বিদায়কালে মাতা তাঁহার হাতখানি বিজয়ের সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। বিজয় সেই বালকের শীর্ণ, দুর্ব্বল হাত দুইখানি ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমরা সকলে হাঁ করিয়া এই পবিত্র দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। পরের জন্য এইরূপ করিয়া যে কাঁদিতে পারে, সে নিশ্চয়ই দেবতা। শত কার্য্যে আমরা বিজয়ের করুণার পরিচয় পাইয়াছি। বিজয়ের সংস্পর্শে অতি মলিন জীবনও পুণ্যময় হইয়া উঠিত। শুনিয়াছি, স্পর্শমণি লোহাকে সোনা করে, পাপমলিন মনকে যে চিন্তামণি নিষ্পাপ উজ্জ্বল করিয়া তুলে, লোহাকে সোনা করার স্পর্শমণি তাহার কাছে অতি তুচ্ছ। জীবনপথের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া এখনও কৈশরের সেই কথা বিস্মৃত হই নাই।

কখন কখনও শান্তিপুরে ৺শ্যামচাঁদের মন্দির প্রাঙ্গণস্থ আটচালায় বহু সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। গ্রামস্থ নরনারী সাধুদর্শনের জন্য ঐ স্থানে আগমন করিতেন। বিজয় প্রায় সর্ব্বদাই তথায় উপস্থিত থাকিতেন। সেই সময়কার পবিত্র দৃশ্য অদ্যাপি আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। প্রত্যূষে উপস্থিত হইয়া দেখিতাম, কোন কোন সাধু চর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া নাম গান করিতেছেন। কেহ অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া হোম করিতেছেন। কেহ বা স্নানান্তে সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন করিতেছেন। বিজয় মুগ্ধ হৃদয়ে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সাধুদের ক্রিয়া-কলাপ নিরীক্ষণ

করিত। বিজয়কে দেখিয়া সাধুহৃদয়ও আকৃষ্ট হইত। তাঁহারা সস্নেহে বিজয়কে নিকটে উপবেশন করাইয়া একদৃষ্টে বালকের শুভ লক্ষণাবলী দেখিতে দেখিতে বালকের অসাধারণত্বের সম্বন্ধে পরস্পর কথোপকথন করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, "এ সহজ বালক নহে। ছলক্রমে কোনও মহাপুরুষ মহান্ উদ্দেশ্য সাধন জন্য আসিয়াছেন।" তাঁহারা বালকের সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন করিয়া দিতেন, কাপড় খুলিয়া কৌপিন পরাইয়া দিতেন।

নবসাজ বিজয়কে অধিকতর সুন্দর ও প্রীতিকর করিয়া তুলিত। আমরা বিস্ময়বিহ্বলনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। এই বেশে তিনি জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেন, 'দেখ মা, কেমন মানিয়েছে।' বাস্তবিক সে দৃশ্য অনির্ব্বচনীয়। সকলেই অনিমেষনয়নে এই পবিত্র দৃশ্যের দিকে চাহিয়া থাকিত, কাহারও মুখে কোনও কথা সরিত না। পরে সন্ন্যাসীদিগের সমুদয় কথাবার্ত্তা অবগত হইয়া জননী বালকের মুখচুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিতেন। পাছে বালকের কোনও অমঙ্গল ঘটে, এই আশঙ্কায় তাঁহার স্নেহপূর্ণ হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সন্ধ্যার সময় বিজয়কে লইয়া পুনরায় আমরা সাধুদিগের নিকট উপস্থিত হইতাম। দেবালয় হইতে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিত হইয়া উঠিলে আমরা সমস্বরে ভজন আরম্ভ করিতাম। বিজয়ের তাৎকালিক অবস্থাদর্শনে সাধুরা পরস্পর কত কথাই বলাবলি করিতেন। ভক্তিহীন আমরা সে মহান্ ভাব ধারণা করিতে না পারিয়া, উদাসভাবে চাহিয়া থাকিতাম।

বিজয় জ্যোৎস্না-পুলকিত গঙ্গাতীরে বসিয়া মুক্ত প্রকৃতির স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য্য দেখিতে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন। বৈকালে আমরা সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মন্দাকিনীর কূলে বসিয়া সূর্য্যাস্তশোভা নিরীক্ষণ করিতাম। বিজয় স্মিত-মুখে বিস্ময়-পুলকিত নেত্রে বসিয়া থাকিতেন। ক্রমে নিশানাথ

গগনমণ্ডল আলো করিয়া উদিত হইলে আমরা বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিতাম, কিন্তু ভাববিহ্বল বিজয় সহজে উঠিতে চাহিত না, অগত্যা আমরা তাহাকে টানিয়া তুলিতাম। ফিরিবার প্রাক্কালে বিজয় ভক্তিভাবে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরোদ্দেশে প্রণাম করিত। পথিমধ্যে আমাদের বৃন্দাবনচন্দ্রের অপূর্ব্ব আবির্ভাব কাহিনী সম্বন্ধে কতই কথোপকথন হইত। বিজয় এই গল্প শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন, প্রত্যেকদিনই ইহা তাঁহার নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইত। কৈশোরের সেই ধর্ম্মবিজড়িত সুখস্মৃতি অকস্মাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায় তোমাদিগকে সেই ভক্তি-উদ্দীপক গল্পটী অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আজ না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"শান্তিপুরস্থ সূত্রাগড় নামক স্থানে একজন ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি একদিন গঙ্গাস্নান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, একটী মনোহর অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্ত কি ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার নীলোজ্জ্বল বর্ণ ও হস্তপদাদির দিব্য শোভা-দর্শনে ব্রাহ্মণের চিত্ত আকৃষ্ট হইল; বোধ হইল যেন, গঙ্গাতরঙ্গে একটী প্রস্ফুটিত সুনীল কমল ভাসিয়া যাইতেছে। ভক্ত ব্রাহ্মণ আর থাকিতে পারিলেন না, সেটীকে ধরিবার জন্য স্রোতোভিমুখে বেগে সন্তরণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে ইহাও প্রতীত হইতে লাগিল যেন, সেই মূর্ত্তিটী—আমাকে শীঘ্র "ধর ধর" বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিতেছে। গঙ্গাতরঙ্গমধ্যে ভক্তহৃদয়ে আরও ভক্তির তরঙ্গ বাড়িল, প্রেমের প্রবাহ শতগুণ বেগে ছুটিল। ব্রাহ্মণ শীঘ্রই মূর্ত্তিটীকে ধারণ করিলেন এবং কোলে লইয়া কূলে উঠিলেন। দেখিলেন, শ্যামোজ্জ্বল আনন্দময় মুখমণ্ডল অকুলের কাণ্ডারী—শ্রীহরি গোপীকুল-বিহারী—ত্রিভঙ্গ বংশীধারীর শ্রীমুর্ত্তি তাঁহার কোলে আসিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছে। প্রভু যমুনাপারকালে একবার বসুদেবের ক্রোড়ে উঠিয়া-

ছিলেন, আর আজ ভক্তকে কৃতার্থ করিবার জন্য গঙ্গা-সলিলচারী হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ক্রোড়ে আসিয়া উঠিলেন। ভক্তবৎসল ভক্তের প্রতি কখন্ কিভাবে দয়া করেন, তাহা আমাদের সাধারণবুদ্ধির দুরধিগম্য। ব্রাহ্মণের আনন্দের সীমা রহিল না। জন্মজন্মান্তরের সাধিত বহু তপস্যার ধন পাইয়াছেন বলিয়া—মন প্রাণ তাঁহার নৃত্য করিতে লাগিল। আগ্রহসহ এই শ্রীবিগ্রহকে কোলে লইয়া সবেগে নিজ বাটীতে সমাগত হইলেন, এবং যথাস্থানে যোগিজনদুর্লভ ভক্তপ্রাণ-বল্লভের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিয়মিত সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

প্রভুর সেবা করিতে সুবিধা পাইলাম মনে করিয়া ভক্ত ব্রাহ্মণ, কতই আনন্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে চিরপোষিত কত আশালতা কুসুমিত হইয়া উঠিল, আপনাকে কতই ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুর বিচিত্র কার্য্য-কৌশল কে বুঝিবে? ব্রাহ্মণ নিশাতে নিদ্রাগত হইয়াছেন,—এমন সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন যেন সেই শ্রীমূর্ত্তি আসিয়া বলিতেছেন,—'আমি সন্ন্যাসীর ঠাকুর, আমি গৃহস্থের নিকট থাকিব না। তুমি আমায় গুপ্তি-পাড়ায় সত্যদেব সরস্বতীর নিকট রাখিয়া আইস।' পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ ঐ স্বপ্নকে অমূলক চিন্তামাত্র মনে করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক প্রেম ও উপচারসহ প্রভুর পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের কল্যাণবিধানার্থ আবার রাত্রিতে স্বপ্নে দর্শন দিলেন এবং বলিলেন—"আমাকে তোমার নিকট রাখিলে তোমার অনিষ্ট হইবে, তুমি শীঘ্র আমাকে সত্যদেবের কুটীরে রাখিয়া আইস!"

ভক্তের প্রাণ কি ভগবানের সেবায় কখনও বাধা বিঘ্ন বিড়ম্বনার দিকে তাকায়? প্রভুর জন্য ভক্তে যে সকল সুখই বিসর্জ্জন দিতে পারে। ইহাই হৃদয়ে দৃঢ়তররূপে ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ পূজার সময় কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীমূর্ত্তির নিকট বলিতে লাগিলেন—"প্রভো! তুমি আমাকে

সংসারের ইষ্টানিষ্টের ভয় দেখাইতেছ কেন? অনিষ্টের ভয়ে কি প্রভু তোমার চরণসেবা পরিত্যাগ করিতে পারি? যদি দয়া করিয়া ধরা দিয়াছ, তবে এ দুঃখীকে আর বিড়ম্বিত করিও না।" দিবাভাগ কাটিয়া গেল। ব্রাহ্মণ নিশায় নিদ্রাযোগে আবার ভগবানের দর্শন পাইলেন। দেখিলেন, যেন জগৎপ্রভু বলিতেছেন, "যদি তুমি আমাকে সন্ন্যাসীর আশ্রমে না রাখিয়া আইস, তাহা হইলে তোমার বংশ বিনাশ হইবে।" প্রভুর এই নিদারুণ বাগ্-বজ্রে ব্রাহ্মণের মর্ম্ম আহত হইল সত্য,—কিন্তু চিত্ত তাঁহার সেবায় পরাঙ্মুখ হইল না। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "প্রভো! তুমি যতই ভয় দেখাও না কেন, আমি তোমার পদপঙ্কজসেবা পরিত্যাগ করিব না। যাহার নাম করিলে শমনভয় দূর হইয়া যায়,—সেই প্রভু তুমি ঘরে থাকিতে আবার—ভয় কিসের? না হয়, সংসারে আমার সর্ব্বনাশ হইবে, কিন্তু তোমার চরণসেবায় তৎপর থাকিলে আমার আবার অভাব ও আবশ্যকতা কিসের? বংশরক্ষা ত পিণ্ডদানাদির জন্য! আর মুক্তির জন্য। প্রভু তোমার সেবা করিলে কি নরক ভয়, বা জন্মজন্মান্তরের ভয় থাকে? আমার বংশ থাকিয়া কাজ নাই।" তোমার চরণচ্ছায়া আমার হৃদয়ে থাকিলেই হইল। প্রভু ভক্তকে আর কোন কথাই বলিলেন না।" ভক্ত প্রভুকে "ভয়ং ভয়ানাং, ভীষণং ভীষণানাং, গতিং প্রণানাং, পাবনং পাবণানাং" জানিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার নিয়মিত সেবা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন এইরূপ সেবা করিতে করিতে ভক্ত ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠবাস করিলেন এবং তাঁহার পুত্রবর্গ একটি একটি করিয়া সকলগুলিই কাল-কবলে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণের একটী মাত্র কন্যা ছিলেন, তিনিও বিধবা হইলেন। কন্যাটী অতি ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি পিত্রালয়ে থাকিয়া ঐ ত্রিজগৎকর্ত্তা ভর্ত্তার সেবায় তৎপর থাকিলেন।

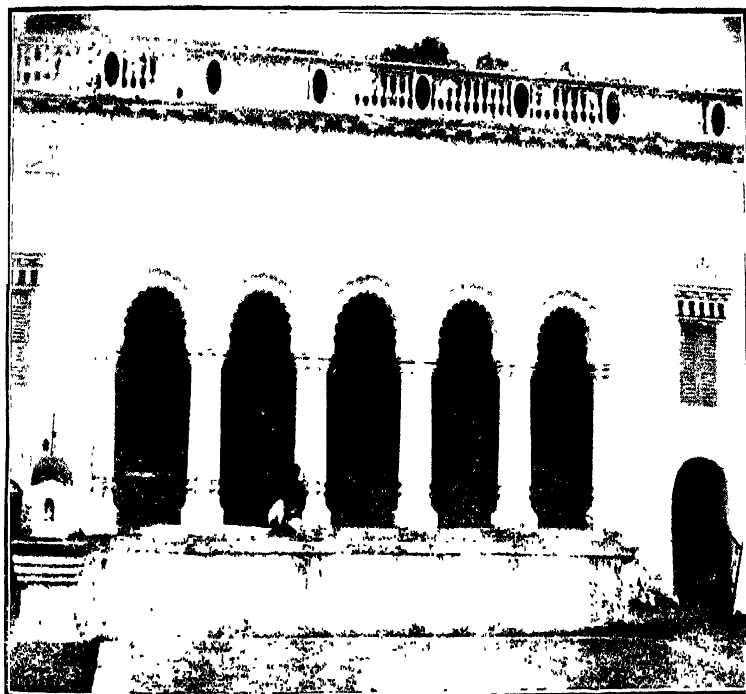
ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে একজন যোগাঙ্গসাধনপটু সন্ন্যাসী যদৃচ্ছা-ক্রমে গুপ্তিপাড়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।—ইঁহারই নাম শ্রীমৎস্বামী সত্যদেব সরস্বতী। যোগিবর ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা দিনপাত করিতেন এবং নিজ কুটীরে বসিয়া নির্জ্জনে নিরঞ্জনের সাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। কিছুদিন গুপ্তিপাড়ায় এই মহাপুরুষ সাধনা করিতে করিতে, কি জানি, কাহার প্রেরণায় গঙ্গার পরপারে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। সেই দিন নিশাবসানের পূর্ব্বে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেন শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র আসিয়া বলিতেছেন, 'তুমি আমাকে লইয়া আসিয়া এখানে প্রতিষ্ঠা কর!' এই আদেশ পাইয়াই সন্ন্যাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিরবলম্ব সাধু পরপারে গমন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একটী ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহে লোকজনের বড় সাড়াশব্দ নাই, বালক বালিকার কোলাহল নাই। অথবা কেহ সে বাটীতে থাকে বলিয়া অকস্মাৎ বোধ হয় না। সরস্বতী স্বামী ধীরে ধীরে গৃহের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সেখানে পুরুষের নামগন্ধ নাই, কেবল একটী সুরূপা নারী বিজনে আসনে বসিয়া সম্মুখস্থ জগন্মনোহর একটী অপূর্ব্ব কৃষ্ণমূর্ত্তির পূজা করিতেছেন এবং মনের মত নৈবেদ্য সাজাইয়া ভক্তিভরে ভগবান্‌কে উৎসর্গ করিয়া দিতেছেন। নিভৃত-নিলয়ে সরস্বতী স্বামিজী দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের দিব্যমূর্ত্তি দর্শনে বিমোহিত হইলেন, এবং দেখিলেন, যেন প্রভু ঐ কামিনীর করকমলে সজ্জিত নিবেদিত মিষ্টান্নরাশি ভোজন করিতেছেন। যাহা কেহ কখনও দেখিতে পায় না,—যাহা দেখিলে আর কিছু দেখিতে ইচ্ছা হয় না, ভগবান স্বয়ং না দেখাইলে যাহা জীবের কোনও ক্রমেই দেখিবার উপায় নাই, তাহাই আজ কৃতকৃত্য সাধু দর্শন করিয়া নিজ নয়ন পরিতৃপ্ত করিলেন। তাঁহার যেন এইরূপ বোধ হইতে লাগিল যে, ঐ যোগিজনমনোমোহন বিগ্রহ

তাঁহার সহিত আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, এবং ইহাও বুঝিলেন, তিনিই সেই স্বপ্নদৃষ্ট শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র। সাধু দেখিলেন, এই ভাগ্যবতী যুবতী ভগবানের অকপট প্রেমে সাশ্রুলোচনে গদ্‌গদ বচনে ভগবচ্চরণে কতই স্তুতিবাদ করিতেছেন। সন্ন্যাসী ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে এবং নিকটে অনুগত ভক্তকে দর্শন করিয়া আনন্দে আপ্লুত হইলেন।

ক্ষণবিলম্বে ঐ ভক্তিমতী সাধ্বী সতী আসন হইতে উঠিয়া দেখিতে পাইলেন, প্রাঙ্গণে একজন তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসী বিরাজমান। তখনই তিনি সসম্ভ্রমে সচকিত হৃদয়ে গিয়া সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভো আপনি কে? কোথা হইতে কি জন্য এই দেবনিকেতনে আগমন করিয়াছেন?" সাধু ভগবানের ভোজন-দর্শনে এবং সাধ্বী সতীর ভক্তিভাবে বিমুগ্ধ হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন। ভক্তিমতীর সুমধুর সম্ভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মা! আমি একজন ক্ষুদ্র জীব, সন্ন্যাসাশ্রমী, ভিক্ষার জন্য এখানে আসিয়াছি।" সাধ্বী এই কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং বলিলেন, "আপনি যথাভিরুচি ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া এই দুঃখিনীকে কৃতার্থ করুন।" ইহা শুনিয়া স্বামীজি বলিলেন, "আমি দণ্ডী, অন্ন স্পর্শ করা আমার পক্ষে নিষেধ; অতএব আপনি যে অন্ন ভগবানকে নিবেদন করিয়াছেন, ঐ অন্ন ভিন্ন, অপর কিছু ভিক্ষা করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই।" সাধ্বী তখনই তাহা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। সাধু কহিলেন, "এই ভিক্ষার দক্ষিণা চাই, কিন্তু আমি টাকা কড়ির প্রয়াসী নহি।" সতী কহিলেন, "বাবা, তবে কি দক্ষিণা দিব?" সাধু কহিলেন,—'আপনার ঐ দেব-মূর্ত্তিটী!" সাধ্বী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, এইটী ভিন্ন আর যাহাই চাহিবেন তাহাই দিব।" সন্ন্যাসী বলিলেন,—"মা, তবে আমার ভিক্ষা গ্রহণ করা হইল না!"

ব্রাহ্মণকন্যা তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, "প্রভু আজ আমাকে কি ঘোর বিপাকে ফেলিলেন। অতিথি সন্ন্যাসী অনাহারে গৃহ হইতে ফিরিয়া যাইবে, ইহাতে ত মহাপাপ। প্রভুর বিরহে আমি অনাথিনী হইয়া থাকিব, সেও ভাল, তথাচ অতিথিসেবায় অবহেলা করিব না" এবং প্রকাশ্যে বলিলেন, "নারায়ণ, আমি আপনার আদেশ পালন করিব, আপনি প্রসাদ গ্রহণ করুন।" সন্ন্যাসীকে পক্কান্ন প্রসাদ ব্যঞ্জনাদি সেবা করিতে দিয়া সাধ্বী সতী নিজ পূজার আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন ও ভগবানের কাছে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "প্রভো, তুমি যে এখানে থাকিবে না, তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানি। তুমি উপরতিযুক্ত সংযমী সন্ন্যাসীর সেবা বড় ভালবাস। তাই পিতাকে বংশনাশের ভয় দেখাইয়া তোমাকে সন্ন্যাসীর কুটীরে পাঠাইতে বলিয়াছিলে। পিতা তাহাতেও ভয় না পাইয়া তোমার সেবা করিলেন। তোমার শ্রীমুখের বাক্য মিথ্যা হইবে কেন? একটী একটী করিয়া এ বাটীর সকলেই ইহলোক পরিত্যাগ করিল;—আছি কেবল একাকিনী আমি। প্রভো, বলিবার কিছু নাই, চাহিবার কিছু নাই, প্রাণ থাকিতে তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিব না, তাই কাঙ্গালিনীর প্রতি দয়া করিয়া নিজ চরণে বিলীন করিয়া লও।" গদ্‌গদবচনে ভক্তিভরে এই কথা বলিতে বলিতে সাধ্বী ভগবানের চরণপদ্মের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতে লাগিল, অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে ক্ষণমধ্যে ভক্তিমতীর নিশ্বাসের পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল, মহাযোগিনী মানবলীলা সংবরণ করিলেন। *

* শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের এই অলৌকিক আবির্ভাববিবরণী শান্তিপুরের প্রায় প্রত্যেক হিন্দু পরিবার মধ্যে প্রচলিত আছে; কারণ বৃন্দাবনচন্দ্র প্রথমে এখানেই ছিলেন। পরে সেবাপরায়ণ ভক্ত ব্রাহ্মণের বংশ নির্ম্মূল হইলে তিনি সত্যদেব সরস্বতী কর্ত্তৃক গুপ্তিপাড়ায় নীত হয়েন। প্রভুপাদ গোলক কিশোর মহাশয় বলেন যে "সে আজ অনে



শ্রী শ্রীশ্যামসুন্দর জীউর মন্দির

Ganesh Printing Works

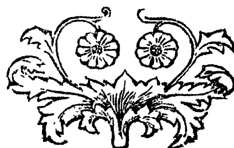
শান্তিপুরের গঙ্গার পরপারে এই শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির। স্নানঘাট হইতে এখনও শ্রীমন্দিরের বিজয়চূড়া পরিদৃষ্ট হয়। বিজয় ঐ মন্দিরে যাইতে এবং সেবকের মুখেও বিগ্রহের আবির্ভাবকাহিনী শুনিতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সেবক যখন উহা বর্ণনা করিতেন, তখন বিজয়ের পবিত্র মুখমণ্ডল গভীর ভক্তিভরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। চক্ষুর্দ্বয় হইতে দরদরিতধারে প্রেমাশ্রু পড়িত। একদিন বিজয় শ্রীশ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দর্শন করিতে করিতে অত্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিলেন। নয়নে যেন প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে বালক নিস্পন্দ হইয়া গেল। ডাকাডাকিতেও কোন সাড়াশব্দ নাই। হস্তপদাদি অবশ, চোখে মুখে অনেকক্ষণ জলসেচন করা হইল; আমরা সকলে ভয়ে কাঁদিয়া উঠিলাম। বহুক্ষণ নাম শুনাইতে শুনাইতে বালকের চেতনা হয়।

আমরা দোল করিতাম। তখন শান্তিপুরে গঙ্গাতীরস্থ বক্তার নামক স্থানে একজন বাবাজী বাস করিতেন, ইঁহার জন্মস্থান উড়িষ্যা দেশে ছিল। ভারতের নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে উক্ত স্থানে তাঁহার সাধন-ভজনের অনুকূল বিবেচনায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বহুদিন বাংলা দেশে অবস্থান করায়, ইঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়াই বোধ হইত। তাঁহার আশ্রমে আমাদিগের মহোৎসব চলিত। বাবাজী

দিনের কথা—প্রসিদ্ধ বাগ্মী পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেনমহাশয় শান্তিপুরে শ্রীশ্রীমদন গোপাল জীউর নাট্যমন্দিরে একবার ধর্ম্মবক্তৃতা-উপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমি তাঁহাকে এই পাষাণে প্রেমসঞ্চারকারী কাহিনী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুললিত ভাষায় জনসাধারণের উপকারার্থ প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম উহা প্রকাশিত হইলে একখণ্ড তিনি পাঠার্থ আমাকে পাঠাইয়া দেন।" প্রভুপাদ গোলক কিশোর উক্ত কাহিনীটী যথাবথ পরিব্রাজকের ভাষাতেই সন্নিবেশিত করিতে অনুরোধ করায়, গ্রন্থের বিষয়ীভূত না হইলেও আমি উহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। পাঠক পাঠিকাগণ এজন্য ক্ষমা করিবেন।

বিজয়কে বড় ভালবাসিতেন, বিজয়ও এখানে না আসিলে থাকিতে পারিত না। বাবাজীর আশ্রমটী বড়ই মনোরম ছিল। এই নিভৃত কুঞ্জে আমাদিগের হৃদয় স্বতঃই ছুটিয়া যাইত। এখানে বসিয়া আমরা পরিচিত স্থরে ভজন গান করিতাম।

বাবাজী গাহিতেন, "আজ হোলি খেলিব শ্যাম তোমার সনে, একাকী পেয়েছি তোমায় নিধুবনে।" বিজয় এই শান্তিপূর্ণ পবিত্র তপোবনে বসিয়া ভক্তিভরে স্থরে স্থর মিলাইয়া গান ধরিতেন, অশ্রুধারায় ভূমিতল সিক্ত হইয়া যাইত, মুহুর্মুহু কম্প হইতে থাকিত, সেইরূপ কম্প কখনও দেখি নাই, দারুণ শীতের সময় অনাবৃত গাত্রে থাকিলেও সেরূপ কম্প হয় না, ক্রমে শরীর স্থির হইয়া যাইত, প্রাণের সমুদয় লক্ষণ নিভিয়া যাইত। আমরা সকলেই ভীত হইতাম, বাবাজী বলিতেন, "ইহাব নাম 'মহাভাব বা সমাধি।" নাম শুনাইতে শুনাইতে বহুক্ষণ পরে চেতনার সঞ্চার হইত, আমরা বিহ্বল নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। বিজয়ের স্মৃতি বুকের মধ্যে একটা গভীর বেদনা জাগাইয়া তুলে, মনে হয়, সে কোন স্বর্গচ্যুত দেববালক। খেলা ছলে দুদিনের জন্য আসিয়া খেলার ঘর বাঁধিয়াছিল, খেলা সাঙ্গ হইলে ঘর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। দেবতা চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পরিত্যক্ত মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে। বিজয় চলিয়া গিয়াছেন তাঁহার পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ের জীর্ণপঞ্জরে অঙ্কিত রহিয়াছে।





টোলে অধ্যয়ন

মাতুলালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বালক বিজয়কৃষ্ণ টোলে প্রবিষ্ট হন। সেই সময়ে শান্তিপুরে গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটি টোল ছিল। বহু ছাত্র তৎকালে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। টোলের নিয়মানুসারে সকল ছাত্রকেই প্রথমে ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে হয়। ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিলে সাহিত্য পড়া আরম্ভ হয়। গোস্বামী মহাশয় এই টোলে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী বলেন :—

"আমার বয়স যখন ১০ কি ১১ বৎসর, তখন আমি বিজয়কৃষ্ণ ভায়ার সহিত রাধামাধব প্রামাণিকের ঠাকুরবাড়ীর উঠানে বসিয়া বদনচন্দ্র গুরুমহাশয়ের আখড়ায় একসঙ্গে লেখা পড়া শিখিতাম। গুরুমহাশয়ের বজ্রকঠোর শাসন তখন আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়কে সম্পূর্ণ বিভীষিকা-বিহ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। পাঠশালায় যাইতে বিলম্ব হইলে গুরুমহাশয় হাতছড়ি মারিতেন। হাতে মারিবার জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় উহাকে হাতছড়ি বলিত। একদিন গুরুমহাশয় হাতছড়ি মারিবার সময় রাম, দুই, তিন ইত্যাদি গণনা করিয়া মারিতে লাগিলেন। এইরূপে ছড়ি

মারা শেষ হইলে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গুরুমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ছড়ি মারিবার সময় প্রথমে রাম নাম উচ্চারণ করিয়া পরে দুই তিন এইরূপ গণনা করিলেন কেন? রাম, কৃষ্ণ, হরি, এই সকল পতিত-পাবন নাম লইয়া গণনা করিলেই বেশ হইত।

বালকের এই সুমধুর কথাটি অদ্যাপি আমার হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে। বাল্যকালেই তিনি নামের সরসতার পূর্ণাস্বাদন করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। গৃহহীন, অন্নহীন দরিদ্রের জন্য যেন ভগবান্ স্বর্গ হইতে মমতা পাঠাইয়া তাঁহার হৃদয়কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুঃখী, কাঙ্গাল, ভিখারী দেখিলে জল খাবারের পয়সা খুলিয়া তাহাদিগের হাতে দিতেন। পক্ষিমাতা যেমন পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহার বিপন্ন শাবকগণকে রক্ষা করে, বিজয়ও তেমনি উন্মুক্ত হৃদয়ে বিপন্নদিগকে রক্ষা করিতেন।

ঐ পল্লীতে রামলাল কুম্ভকার নামে একটি বালক ছিল। তাহার মাতা উলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইলে লোকের অভাবজনিত কষ্ট শুনিয়া বিজয় গোস্বামী নিজে তাহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন; ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া আমি গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোলে পড়িতে গেলাম। তিন কি চারি বৎসর পরে ঠিক মনে নাই, বিজয় গোস্বামী একখানি ব্যাকরণ পুস্তক কক্ষে লইয়া ঐ টোলে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ব্যাকরণখানি হাতের লেখা মুগ্ধবোধ। উপরিভাগে কাঠের মলাট, তদুপরি রক্তবর্ণের বস্ত্রাবরণ। ঐ পুস্তকের কাঠের মলাটে গোবৎস এবং কৃষ্ণ বলরাম চিত্রিত ছিল। বিজয় ভায়া আবৃত্তি করিবার পূর্ব্বে ঐ কৃষ্ণবলরাম দর্শন করিতেন। ঐ সময় তাঁহার দরদরিতধারে অশ্রু পতিত হইত। আমাদের অধ্যাপক এই ব্যাপার দর্শন করিয়া বলিতেন:—"এই বয়সেই এই অনুরাগ, এ কোন শাপভ্রষ্ট

মহাপুরুষ, কখনও গৃহে থাকিবে না।" আবার কখনও কখনও বলিতেন, "এ ক্ষেপা ছেলে দেখ্‌ছি।"

গোস্বামী মহাশয়ের বাল্যজীবনের দানশীলতা ভবিষ্যতে তাঁহাকে মহা-দানব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিল। বাস্তবিক তিনি কাঙ্গালের বন্ধু ছিলেন। টোলের পূর্ব্বধারে রাধানাথ প্রামাণিক নামে একটি প্রাচীন দুঃখী লোক বাস করিত। সে কাজকর্ম্ম করিতে পারিত না। বিজয় গোস্বামী টোলে আসিবার সময় জননীর নিকট হইতে জলখাবার জন্য একটি করিয়া পয়সা পাইতেন এবং ঐ পয়সা দ্বারা জলখাবার না কিনিয়া রাধানাথকে উহা প্রদান করিতেন। কোন কোন দিন অঞ্চলে করিয়া চাউল আনিয়া রাধানাথকে প্রদান করিতে দেখিয়াছি। রাধানাথ কৃতার্থ হইয়া যাইত।

শৈশবেই বিজয়ের হৃদয়ে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। টোলের দক্ষিণাংশে হরিনারায়ণ গোস্বামীর বাটী। ঐ বাটীতে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঐ বিগ্রহের নাম বিজয় কৃষ্ণচন্দ্র। বিজয় গোস্বামী ভায়া টোলের পাঠ শেষ হইলে প্রতিদিন ঐ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে যাইতেন। একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে গেলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা এখনও হৃদয়ের প্রতি পরতে অঙ্কিত হইয়া আছে। সম্যক্ ব্যক্ত করিবার শক্তি আমার নাই। দেখিলাম, বিজয়কৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তির দিকে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিয়াছেন। দৃষ্টি স্থির, নয়নে দুই এক বিন্দু অশ্রু, হৃদয় ভাব-রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট। ডাকিলাম নিরুত্তর। বলিলাম "হারে তুই ঠাকুর দেখে কাঁদছিস্ কেন?" কোন উত্তর পাইলাম না। আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিলাম। বাল্যকালেই তিনি শান্ত ও সদানন্দ-মূর্ত্তি ছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোন দিন তিরস্কার করিলেও তাঁহার মূর্ত্তিতে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হইত না। একদিন তিরস্কারচ্ছলে তিনি বিজয়কে বলিলেন, "হাঁরে তুই প্রতিদিন ঠাকুর দেখতে যাস্ কেন?" "পড়া শুনা

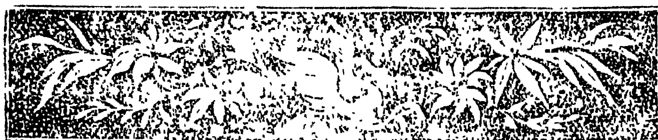
ত্যাগ করে ঠাকুর দেখতেই ব্যস্ত, আগে পড়া শুনা কর, বেশ ব্যুৎপত্তি জন্মাক, তারপর ও সকল করিস। বালক নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

একদিনকার ঘটনা এখনও বেশ মনে আছে। অধ্যাপক মহাশয়ের টোলঘরে আমরা চাঁদা করিয়া সরস্বতী পূজা করিয়াছি। পূজা শেষ হইলে আমরা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন ছাত্র বাগ্দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম। পুষ্পাঞ্জলিপ্রদানকালে বিজয়ের হৃদয়ে প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। অধ্যাপক গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যাপার দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন। সহাধ্যায়িগণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। অধ্যাপক বলিলেন, "এ সহজ ছেলে নয়। এই বয়সেই যেরূপ ভক্তি দেখিতেছি, ইহার দ্বারা নিশ্চয়ই অদ্বৈতবংশের নাম উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।"

বিজয়ের স্নিগ্ধ সদানন্দ মূর্ত্তি, স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত লোচনদ্বয় ও স্নেহপূর্ণ পবিত্র হৃদয়, ত্রিতাপক্লিষ্ট ব্যক্তির প্রাণেও বিমল আনন্দধারা প্রবাহিত করিয়া দিত। তাঁহার নিকট বসিলে মন প্রাণ জুড়াইয়া যাইত। তাঁর বাতাস গায়ে লাগিলে হৃদয় পবিত্র হইয়া উঠিত। একদিন রাম, বিজয় ও গ্রহপতিধর্ম্মাচার্য্য এই তিন জন আমার সহিত আমাদের নাটমন্দিরে কীর্ত্তন শুনিতে আসিতেছিলেন। জজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পীতাম্বর তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি যে পাস্তঘাসী নামক একটী লোকের বাঁটুলের দ্বারা আহত হইয়া সম্মুখস্থ অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে একটী ঘুঘু পক্ষী ধরাশায়ী হইল। আহত পক্ষীটীকে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া বিজয় সজলনয়নে আমাকে বলিল "জয়গোপাল দা! কে এমন নিষ্ঠুর কার্য্য করিল? তাহার প্রাণ এই নৃশংস দৃশ্য সহিতে না পারিয়া পক্ষীটীকে বুকে লইয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাম ছুটিয়া গিয়া নিকটবর্ত্তি "চোর পুকুর" হইতে জল আনিয়া পক্ষীর মুখে ও গাত্রে প্রদান করিল। মরণোন্মুখ পক্ষী দুই

একবার কণ্ঠনালী নড়াইয়া পক্ষিজন্ম শেষ করিল। মৃতপক্ষী হস্তে বিজয়কে কাঁদিতে দেখিয়া তর্কবাগীশ মহাশয়েরও চক্ষে জল আসিয়াছিল, তিনি সস্নেহে বালককে কোলে টানিয়া লইয়া বহু চেষ্টায় তাহাকে শান্ত করিলেন। এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া পান্ত চিরদিনের মত শীকার ত্যাগ করিয়াছিল।





উপনয়ন ও দীক্ষা।

শুভদিনে নবম বর্ষের শিশু যজ্ঞসূত্র ধারণ করিলেন মুণ্ডিতকেশ, গৈরিকধারী, বাল ব্রহ্মচারী একাদশ দিবস দণ্ডগৃহে অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি অভ্যাস করিয়াছিলেন। অদ্বৈতবংশাবতংস, ষড়্‌দর্শনবেত্তা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল তর্করত্ন বালককে গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করিলেন। এই সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে, তাঁহার আদর্শে ও শিক্ষাধীনে বালক অল্পেই নিষ্ঠাবান হইয়া উঠিল। প্রতি প্রভাতে গঙ্গাস্নান করণানন্তর বিজয় যখন ঋক্ গান করিতেন তখনকার সেই সুমিষ্ট বৈদিক সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সকলেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইত।

উপনয়নের পর তিনি তাঁহার জননীর নিকট কুলপ্রথা-অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্ত্রীলোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে একজন সদাচারী পণ্ডিত ব্যক্তিকে "উপগুরু" রূপে দীক্ষাদানের পদ্ধতিও অনুষ্ঠান গুলি সম্পাদন করিয়া দিতে হয় এইরূপ রীতি এই পরিবারে বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে।—আদর্শ চরিত পণ্ডিত কৃষ্ণগোপালের গুণে মুগ্ধ হইয়া বিজয় স্বেচ্ছায় তাঁহাকে উপগুরু পদে বরণ করিয়াছিলেন। দীক্ষাগ্রহণের পর তিনি তাঁহার চতুষ্পাঠীতে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ যাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন ইনি একজন তৎকালীন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। শুনা যায় ইঁহার পিতা সুরগুরু

বৃহস্পতির ন্যায় পুত্র কামনায় ইষ্টদেবতার আরাধনা করিয়া ইঁহাকে লাভ করেন। পিতা শ্রীগোবিন্দময় গোস্বামী মহোদয়ের তপস্যার ফল আদৌ ব্যর্থ হয় নাই ; পণ্ডিত কৃষ্ণগোপাল তর্করত্ন মহাশয় প্রকৃতই বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিত ছিলেন। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীঅদ্বৈত বংশের অধস্তন নবম পুরুষ অলঙ্কৃত করিয়া সারা জীবন ইনি শিক্ষাদানের নিমিত্তই আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক কৃষ্ণগোপাল আত্মপ্রতিষ্ঠাস্থাপনে একান্ত অনিচ্ছুক থাকায় চিরদিন আপনাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিতে চেষ্টা করিতেন সুতরাং নিকটবর্ত্তী স্থানব্যতীত তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবার সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর গুণের পুরস্কারস্বরূপ কয়েকবার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ ইঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিরাকাঙ্ক্ষ কৃষ্ণগোপাল বিদ্যাবিক্রয় ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে বিবেচনায় ঐপদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

যৌবনের প্রারম্ভে এইরূপ আচার্য্যের শুভসম্মিলনকে মণি-কাঞ্চনের যোগ বলা যাইতে পারে। কৃষ্ণগোপাল বিজয়কে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন ; তিনি বলিতেন "শৈশবেই বালকের হৃদয়ে সদ্‌গুণরাজি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল ; পৃথিবীতে পরপীড়ন, ব্যথা ও হাহাকার দেখিয়া তাহার হৃদয় মমতায় ভরিয়া যাইত। বিজয় জাতিস্মরের ন্যায় স্বতঃই জীবে দয়া ও ভগবানে ভক্তি এই দুটীকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। দীক্ষাগ্রহণের পর বিজয় "হরিবোলা" হইয়া উঠিল। প্রতিদিন স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া শ্যামসুন্দরের পূজা করিত ; এরূপ পুণ্যের সংসারে, ধর্ম্মের ক্ষেত্রমধ্যে, পারিপার্শ্বিক শুভ সংযোগে সর্ব্বোপরি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত এত অধিক উচ্চ সংস্কার লইয়া যাহার জন্ম, সে যে ভবিষ্যতে এই দাবদগ্ধ সংসারকে স্বর্গের সুষমায় পরিণত করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?"

"বিজয়ের অদ্ভুত মেধা আমি দেখিয়াছি, সে আমার কাছে দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিল। প্রথমে কয়েকদিন সাংখ্যদর্শন দেখিয়া পরে বেদান্ত শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। আমি তাহাকে বেদান্ত পরিভাষা ও বেদান্ত দর্শন পড়াইয়াছিলাম। অল্প আয়াসেই বালক শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্বসকল উপলব্ধি করিতে লাগিল—ব্রহ্মজ্ঞান তাহার ভিতর দেখিতে লাগিলাম। মুখ মানবহৃদয়ের দর্পণস্বরূপ। হৃদয়ের ভাব মুখেই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তাহার মুখশ্রীতে অপূর্ব্ব ভাবসকল খেলা করিত। এইরূপে হরিবোলা বিজয় "ব্রহ্মরসাস্বাদানে আত্মনিয়োগ করিল।"





অধ্যাপক-সংবাদ।

(গোস্বামী মহাশয়ের অধ্যাপক শতায়ুর্ব্বৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উক্তি।)

বিজয় হেজেল্ সাহেবের বিদ্যালয়ে সংস্কৃতবিভাগে প্রবেশ করিয়াছিল। আমি তখন ঐ বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ছিলাম। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। বালকের সর্ব্বতোমুখীন প্রতিভা দেখিয়া অধ্যাপকবর্গ বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। গুণ-মুগ্ধ বাল্য-সহচরগণও তাহার একান্ত অনুরক্ত ছিল। এইরূপে বয়ঃকনিষ্ঠ বিজয় গুণে শ্রেষ্ঠ থাকায় দলের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিয়াছিল। বালক কথা কহিত যেন অমৃত ক্ষরিত হইত। এমন মিষ্ট কথা কখনও শুনি নাই।

আজ তোমাদের সহিত কথায় কথায় সমগ্র অতীত স্মৃতি মনে পড়িয়া গেল। সে প্রায় ৮০।৯০ বৎসরের কথা—আমি প্রভুপাদ আনন্দ কিশোরের টোলে অধ্যয়ণ করিতাম। কি গুণে জানিনা—আমি তাঁহার অপার স্নেহে ধন্য ও কৃপাগুণে তাঁহার পরিজনমধ্যে গণ্য হইয়াছিলাম।

একে একে বিজয়ের জন্ম, শিশুজীবন, কৈশোর ও যৌবনের ক্রীড়া-কলাপাদি দেখিলাম। আমি বিজয়ের অধ্যাপক ছিলাম। তাহার অধ্যাপক ছিলাম মনে হইলে এখনও এই জরাজীর্ণ দেহে আনন্দতরঙ্গ উত্থিত হয় ও গৌরবে নয়নপ্রান্তে জলধারা আসিয়া পড়ে। হায়! তখনও আমরা তাহাকে চিনিতে পারি নাই!

নানা কারণে বাল্যাবধি এই শিশুতে দেবতার আবেশ আছে বলিয়া আত্মীয় স্বজনের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। বিজয়ের সমস্তই অদ্ভুত, সমস্তই বৈচিত্রপূর্ণ ছিল। আমি স্বচক্ষে তাহার অন্নপ্রাশন দেখিয়াছি, শ্রীযুক্ত রাধারমন গোস্বামী বালকের মুখে অন্নদান করিয়াছিলেন। অন্নপ্রাশনান্তে শিশুর সম্মুখে নানাবিধ মাঙ্গল্যদ্রব্য সাজাইয়া দিবার রীতি সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে—শিশু যে দ্রব্য ধারণ করিবে তদনুযায়ী তাহার ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপে অতিবাহিত হইবে তাহা অনুমিত হয়। সম্মুখস্থ সজ্জিত দ্রব্যমধ্য হইতে বালক শ্রীমদ্ভাগবত লইয়া খেলা করিয়াছিল। বিজয় যে উত্তর কালে প্রেম ভক্তির মহাভিনয় করিবে এ বুঝি তাহারই পূর্ব্ব সূচনা!

জন্ম হইতেই শিশুর সহজাত ভগবদ্-ভক্তি আপনা আপনিই উছলিয়া পড়িয়াছিল। প্রভুপাদ আনন্দকিশোর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন শিশু স্থির নিস্তব্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিত যেন পরীক্ষিত শুক-মুখ-নিঃসৃত অমৃতময়ী হরিকথা শুনিতেছেন! এই শুভ দর্শন সকলের চিত্ত হরণ করিয়া লইত।

শ্যামসুন্দরের আরতি বাজিলে বালক আর স্থির থাকিতে পারিত না; ছুটিয়া শ্রীমন্দিরে আসিত ও কাঁশর বাজাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিত। আরতি-অন্তে নিত্য কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে বালক আহ্লাদে দুহাত তুলিয়া নাচিতে থাকিত, তাহার সে অপরূপ বালসুলভ নৃত্য-দর্শনে শুষ্ক হৃদয়েও প্রেমের প্রবাহ ছুটিত।

বিজয় শ্যামসুন্দরের সহিত লুকাচুরী খেলিত। সে দুহাতে চক্ষুঃ আবৃত করিয়া তাহার সাধের শ্যামসুন্দরের প্রতি "শ্যামসুন্" "টু" বলিয়া পলাইত, আবার পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া বিগ্রহের প্রতি তাকাইয়া ওঃ ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! "আমায় দেখ্‌তে পেলে না" বলিয়া খিল খিল্ করিয়া হাঁসিয়া উঠিত।

বালকের বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, শ্যামসুন্দরের সহিত তাহার

প্রীতির নিগড় ততই দৃঢ় হইতে চলিল। এখনও শ্যামসুন্দরকে খাওয়াইতে, শোয়াইতে, স্নান করাইতে ও মালা প্রভৃতি পরাইয়া দিতে হয় দেখিয়া বালক মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিত। শ্যামসুন্দরের দুঃখ দেখিয়া শিশুর সরল হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। একবার দোলের সময় ঠাকুরকে সজ্জিত করিতে করিতে অলঙ্কারের ঘর্ষণে শ্রীঅঙ্গে আঁচড় পড়িয়া যাওয়ায় পীড়িত বিজয় কাঁদিয়া উঠিয়া ছিলেন এবং শ্যামসুন্দর যাতনায় কাঁদিতেছেন মনে করিয়া তাঁহার রাঙ্গা চক্ষু মুছাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কবি যথার্থই গাহিয়াছেন :—

"শ্রীনন্দনন্দনে ভজিনু কিক্ষণে
কাঁদি কাঁদি মনু,
তাঁর দুঃখ দেখি মোর দুঃখ সখি
সকলই ভুলিয়া গেনু।"

বিজয় শ্যামসুন্দরের হিংসাও করিত। একবার ফুল দোলের সময় শ্যামসুন্দরকে ফুল সাজে সজ্জিত হইতে দেখিয়া বালক সেইগুলি নিজে পরিবার জন্য বায়না ধরিল। অবশেষে বিফলমনোরথ হইয়া সঙ্গিগণসহ নানাস্থান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া আনিল এবং মাথায় ও গলায় মালা পরিয়া শ্যামসুন্দরকে দেখাইয়া গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিল।

মহৎভাবের সহিত বিজয়ের নানা প্রকার চঞ্চলতা ও কৌতুহলোদ্দীপক চতুরতাও মিশ্রিত ছিল। পরিজনবর্গব্যতীত অপরাপর ব্যক্তিকেও তাহার উপদ্রব সহ্য করিতে হইত। বালক কাহাকেও ক্ষেপাইত, কাহাকেও ভেংচাইত, বৃক্ষশাখা হইতে কাহারও বা মস্তকে প্রস্রাব করিয়া দিত। প্রতিবাসী রামলাল তাঁতিকে দেখিলেই হাতে তালি কিংবা তুড়ি দিতে দিতে তাহার অনুসরণ করিয়া—

"তাঁতি তাঁত বুন্‌তে মন
দুটো কেষ্ট কথা শোন্"—

বলিয়া ক্ষেপাইত। উত্যক্ত রামলাল পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইত। কলহ প্রিয়া স্ত্রীলোকদিগের কলহের অনুকরণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী, হাব ভাব ও তাহাদের স্বরের অনুকরণ করিয়া তাহা দিগকে জ্বালাতন করিয়া তুলিত। গাছের উপর লুকাইয়া থাকিয়া দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তিদিগের মস্তকে থুঁতু দিত। কখনও বা প্রস্রাব করিয়া দিত।

অভিভাবক ও শিক্ষক বলিয়া আমার নিকটে অনেকেই তাহার সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতেন; মুগ্ধ আমি তিরস্কার করিতে যাইয়া অনেক সময়েই বালককে পুরস্কার করিয়া ফেলিতাম।

এই সকল চপলতার সহিত তাহার হৃদয়ে এমন কমনীয়তা ছিল, তাহার তেজস্বিতা ও পরদুঃখকাতরতার মধ্যে এমন সরলতা ও মধুরতা ছিল—তাহার শাসনের মধ্যেও এমন সদাশয়তা ও সহৃদয়তা অপেক্ষা করিত যে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই তাহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

তাহারা দেব দেবী সাজিয়া খেলা করিত—যাত্রার দলের ছোকরা সাজিয়া অভিনয় করিয়া বেড়াইত—বাউলের দল গঠিত করিয়া পূজা বাড়ীতে গান গাহিয়া আসিত—বালকের সুমিষ্ট স্বরে মুগ্ধ হইয়া লোকে তাহাকে দেখিলেই তাহার গান শুনিতে চাহিত, বালকও তৎক্ষণাৎ গান গাহিয়া তাহাদিগের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিত।

বয়োবৃদ্ধির সহিত বিজয়ের চঞ্চলতা ও চতুরতাপ্রভৃতি ভাবগুলি তেজস্বিতা, ধর্ম্মপ্রবণতাপ্রভৃতি গুণগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। এই সময় দেশে সর্ব্ব প্রকার দুর্নীতি, কু-প্রথা ও কুসংস্কার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই দুরবস্থা অবলোকন করিয়া, দেশের সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ও কু-প্রথা নিবারণ, লোকের ক্লেশদূরীকরণ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ জন্য বিজয় একটি দল গঠন করিয়াছিলেন।

তখন বর্ষাকালে পথ পঙ্কিল ও পিচ্ছিল হওয়ার জন্য নিত্যস্নায়ীদের গঙ্গায় যাইতে বড়ই অসুবিধা হইত। পথ ঘাট এতই কদর্য্য হইয়া উঠিত, যে ভয়ে লোকে অবগাহন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত, যাহারা যাইত, তাহারা কাদায় লুটাপুটী খাইত। কেহ বা হস্ত পদ ভগ্ন হইয়া অশেষ প্রকারে নিগ্রহ ভোগ করিত।

লোকের এই প্রকার দারুণ দুরবস্থা দেখিয়া বালক বিজয়কৃষ্ণ সঙ্গিগণসহ বাড়ী হইতে কোদালী লইয়া স্নান ঘাট কাটিয়া দিতেন। নালা কাটিয়া রাস্তার বদ্ধ জল বাহির করিতেন, এবং সাধ্যমত যাতায়াতের ক্লেশ অপনোদন করিবার জন্য, নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। বালকের জনহিতৈষিতা দর্শনে সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার কল্যাণকামনা করিত।

শান্তিপুরে তখন স্ত্রীপুরুষের জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্নান ঘাট না থাকায় সকলেই একত্রে স্নান করিত। বিজয় এই কু-প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বহস্তে পৃথক্ ঘাট কাটিয়া দিয়াছিলেন। তথাপি পাছে স্ত্রীপুরুষে এক ঘাটে অবগাহন করে, এজন্য নিজেরা উপস্থিত থাকিয়া তাহার প্রতিরোধ করিতেন। কতিপয় দুষ্টলোক ইহাতে বিজয়ের প্রতি কুপিত হইয়া, মারপিট করিবার উপক্রম করে, কিন্তু তাহাদের এই অসদভিপ্রায় পূর্ণ হয় নাই। স্থানীয় কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তির চেষ্টায় বালকদিগের এই সদুদ্দেশ্য, তথনকার ডেপুটী বাবু ও ছোট আদালতের হাকিম বাহাদুরের কর্ণগোচর হইলে, তাঁহারা তখন হইতে স্ত্রীপুরুষ দিগের স্নানার্থে দুইটী স্বতন্ত্র ঘাট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, এবং ইহার শৃঙ্খলারক্ষার জন্য, কিছুদিন তথায় দুইজন করিয়া পুলিশ প্রহরী রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

যদুপাল নামে জনৈক দুর্নীতিপরায়ণ লোককে মিষ্ট কথায় কিছুতেই

সংশোধন করিতে না পারিয়া অবশেষে "বাচ" খেলিবার প্রলোভনে একদিন তাহাকে নৌকায় তুলিয়া "মাঝ্ গঙ্গায়" উপনীত হইলে তিরস্কার করিতে করিতে বলিলেন "আজ হইতে তুমি যদি সমস্ত কুঅভ্যাস জন্মের মত ত্যাগ না কর তাহা হইলে এখনই তোমায় জলে ফেলিয়া দিব" বালক অত্যন্ত ভীত হইয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ করিলে বিজয় সান্ত্বনাদানে তাহাকে ছাড়িয়া দেন। বলা বাহুল্য তদবধি বালকটী সম্পূর্ণ রূপে সংশোধিত হইয়াছিল।

দরিদ্রের নিরন্ন কুটীরে, রোগীর রোগশয্যাপার্শ্বে করুণাপূর্ণ হৃদয় লইয়া তাহাদের অন্ন ও পথ্যদানে তাহারা সকলে আত্মোৎসর্গই করিয়াছিল। দেশে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ-সময়ে যখন গৃহে গৃহে মর্ম্মভেদী হাহাকার ও রোগীর আর্ত্তনাদ উঠিত নিরাশ্রয়দের নীরব কুটীরদ্বার হইতে যখন আত্মীয় স্বজনগণ জীবনাশঙ্কায় নানা অজুহাত ও প্রতিবন্ধক দেখাইয়া ধীরে ধীরে পাশ কাটাইতেন তখন বিজয় আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। সকলের পুনঃ পুনঃ নিষেধসত্ত্বেও দেবশিশুর ন্যায় সেখানে সদলবলে আবির্ভূত হইয়া পীড়িতের সেবা ও মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

জ্যৈষ্ঠের এক নিশীথরাত্রিতে ছারপোকা ও মশকের উপদ্রবে শয্যায় শয়ন করিয়া ছটফট্ করিতে করিতে কাতরে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতেছি এমন সময় "আগুন! আগুন!!" এই ভীষণ কোলাহলে তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম তাঁতী পাড়ার একখানি চালায় আগুন লাগিয়াছে ও বিজয় তাহার দলবল লইয়া সেই প্রবল দাবানল নির্ব্বাপিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। সেদিন বিজয় যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতাসহকারে সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিল তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাই না। তাহারই চেষ্টাতে সেই রাত্রে অনেক দরিদ্র তন্তুবায়ের কুটীর ব্রহ্মার করাল কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।



দেউড়ী ও চতুষ্পাঠীর ভগ্নাবশেষ।

কাকিনার ভূম্যধিকারীর অর্থসাহায্যে পিতৃস্মৃতিরক্ষার্থ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ
কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

...ish Printing Works

আর একবার বর্ষার সময় যখন "বাঁওরের"* বাঁধ কাটিয়া দিয়াছিল, আমার মাতা আর্দ্র বস্ত্রে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিলেন "বাবা! বোনো! বিজয় যে আজ কি কষ্টে একটী ছেলেকে খড়-ভাঙ্গা স্রোতের মুখ হইতে বাঁচাইয়াছে তুই দেখিয়া নয়ন সার্থক করিয়া আয়! ছেলেটী এখনও পুলের উপর শুইয়া আছে!" ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম যে স্থানটী লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। বালকটী তখন সকলের যত্নে ও চেষ্টায় উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিতেছে আর নিমজ্জিত বালকের উন্মাদিনী মাতা তাহার পরিজনবর্গসহ বিজয়ের নিষেধসত্ত্বেও তাহার অবশ ও শিথিল হস্ত পদাদি টিপিয়া দিতেছে।

বাল্যেই বিজয়ের উপনয়ন ও দীক্ষা হয়। দীক্ষাগ্রহণের পর বিজয় তর্করত্ন মহাশয়ের টোলে প্রবিষ্ট হন। এই সময় হইতেই তাহার জীবনের গতি অদ্ভুতরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। বালক যথাশাস্ত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান, তপ, জপ, পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি এরূপ ভক্তিভাবে সম্পাদন করিতেন যাহা দেখিয়া বিস্মিত বৃদ্ধেরাও এমন কি অধ্যাপক পর্য্যন্ত বালকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা প্রকার জল্পনা করিতেন। তাহার তাৎকালীন ধর্ম্মজীবনের অবস্থা সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয় নিজে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে আমার বিশেষ আস্থা ছিল। সে ভক্তির অবস্থা স্মরণ করিলে হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। হিন্দুধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাসী ব্যক্তির যে যে লক্ষণ থাকা উচিত, তাহা সমস্তই আমাতে বর্ত্তমান ছিল। দেশের স্ত্রী পুরুষ সকলেই আমাকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতেন"।

* গোস্বামী মহাশয়ের বাটীর অনতিদূরে একটী খাল আছে বর্ষাকালে উহা গঙ্গাজলে প্লাবিত হয়। তখন সকলেই এখানে গঙ্গাস্নান করেন। ঐখালকেই "বাঁওড়" বলিয়া থাকে।

"নিষ্ঠাবান ও আনুষ্ঠানিক হিন্দুর যে সকল লক্ষণ থাকা উচিত, ইহাতে তাহার কোনটীর ক্রুটি ছিলনা। অধিকন্তু সকল গুলিই পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কুল-দেবতা ৺শ্যামসুন্দরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ছিল। একাদশী, রামনবমী, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্বদিনে তাঁহাকে যেরূপ কঠোরতার সহিত উপবাস করিতে দেখিয়াছি তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমরা যদি কোনদিন শ্যামসুন্দরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও তাঁহার শ্রীচরণামৃত গ্রহণ না করিয়াছি, তাহা হইলে বিরক্ত হইয়া আমাদিগকে কতই তিরস্কার করিয়াছেন। মালাতিলকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর মত দেখাইত।

তাঁহার নৈতিক চরিত্র অতিশয় উন্নত ছিল। কখনও তাঁহাকে নীতিবিগর্হিত কার্য্য করিতে দেখি নাই। উদ্দাম যৌবনের কোনরূপ চপলতা তাঁহার দেবচরিত্রকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। থাক নাম্নী কোন হীনচরিত্রা স্ত্রীলোক বাটীতে পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। বিজয় টোল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া জননীকে সম্মুখে উপস্থিত না দেখিলে গৃহে প্রবেশ করিতেন না। বাটীর বহির্ভাগে অপেক্ষা করিতেন। যতক্ষণ জননী আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া না যাইতেন, ততক্ষণ অবিচলিত ভাবে বাটির বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। বন্ধুগণের মধ্যে কাহারও নৈতিক জীবনের সামান্য হীনতা বা অপূর্ণতা দেখিলে বিজয় অতিশয় বিরক্ত হইতেন। শান্তিপুরে * এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার অত্যন্ত প্রণয় ছিল। এমন কি পরস্পরের ক্ষণকাল অদর্শণে উভয়েই ব্যথিত হইতেন। পরে তাহার হীন চরিত্রের কথা অবগত হইয়া সম্পূর্ণরূপে তাহার সংস্রব পরিত্যাগ করেন।

"আমরা কার্ত্তিক মাসে তাঁহার সহিত প্রাতঃস্নান করিতাম।

* আত্মীয়গণের অসন্তুষ্টির ভয়ে নামোল্লেখ করা গেল না।

প্রভাতে শরদের কৌমুদীকিরণে জগৎ হাসিত। আমরা বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গাতীরে অশ্বথতলায় আগমন করিবা মাত্র বৃক্ষ-শ্রেণী হইতে সমস্বরে বিহঙ্গসকল কলধ্বনি করিয়া উঠিত। যেন তাহারা প্রকৃতির সময়রক্ষক হইয়া বৃক্ষে রাত্রি যাপন করিতেছিল প্রভাত হইবা মাত্র উহা জীবজগৎকে জ্ঞাপন করিল। তাহাদের কলধ্বনি ক্রমে ক্রমে দূর গগনে মিলাইয়া যাইত। বৃক্ষপত্র হইতে টুব টাব শব্দে শিশির ঝরিত। আমরা স্নান করিতে করিতে প্রভাত গগনে রক্তিমরাগরঞ্জিত দীনমণি উদিত হইতেন। মাঝিরা সারি গাহিতে গাহিতে নৌকা ছাড়িয়া পরপারে গমন করিত। তাহাদের প্রভাতী সঙ্গীত আমাদের হৃদয়তন্ত্রীকে ধীরে ধীরে প্রেমবিহ্বল করিয়া তুলিত। আমরা দ্রুত সন্তরণে নৌকা ধরিয়া তাহাতে উঠিতাম। কোন কোন দিন পর-পারে অবতরণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরাভিমুখে গমন করিতাম। বিজয় এখানে আসিতে বড়ই ভালবাসিতেন। এই স্থানে আসিয়া আমরা অনুপম সুখানুভব করিতাম। প্রাচীন তপোবনের দৃশ্য আমাদের হৃদয় পটে জাগিয়া উঠিত।” *

বিজয়ের খ্যাতি শান্তিপুরময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল—কোনও ব্রত পার্ব্বণ প্রভৃতিতে ভোজন অথবা দান করাইতে হইলে বিজয়কে ভোজন করাইতে বা দান করিতে পারিলে লোকে পূর্ণফল হইল বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহাকে দান বা ভোজন করাইতে না পারিলে গৃহস্থের তৃপ্তি হইত না।

প্রত্যেক সদনুষ্ঠানের মধ্যে লোকে বিজয়কে জড়িত রাখিত। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নবদ্বীপাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণের মাতা শান্তিপুরস্থ বেজপল্লী নামক স্থানে এক শিবস্থাপনা করেন। এজন্য তখন উহাকে রাণীর শিব বলিত। রাজা রামকৃষ্ণ নদীয়া রাজবংশের পঞ্চম রাজা

* শ্রীরামরক্ষিত মিত্র কথিত।

রূপে সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইনি ভারতবিখ্যাত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের খুল্ল পিতামহ ছিলেন। একবার দেশে বর্ষণের অভাবে কৃষককুল ভীষণ প্রমাদ গণিল। লোকে হাহাকার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ নানা প্রকার তান্ত্রিক ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না। পরিশেষে একজন সন্ন্যাসী ঐ রাণীর শিবকে মহাস্নান করাইলে সুবৃষ্টি হইবে বলায় পল্লীবাসিগণ ঐ কার্য্য করা উহাই উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন। গ্রামস্থ সকলে বিজয়ের দ্বারাই ঐ শিবের স্নান করাইতে একমত হইলেন। সমবেত স্ত্রীপুরুষগণ কলস কলস জল আনিতে লাগিলেন, বিজয়ও পুরুষসূক্ত পাঠ করিতে করিতে মহাদেবের মহাস্নান করাইলেন। সন্ন্যাসীর বাক্যে ফল ফলিল। বরুণদেব মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অনাবৃষ্টি স্থানে সুবৃষ্টি হওয়ায় শান্তিপুর আবার সুফল ও শস্য শ্যামল হইল। তদবধি "রাণীর শিব" এই নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "জলেশ্বর" * নাম হয়।

টোলের পাঠ শেষ করিয়া গোস্বামী মহাশয় তাঁহার বাল্যবন্ধু অঘোরনাথ গুপ্তের সহিত সংস্কৃত কলেজে আসিয়া প্রবিষ্ট হন। এই সময় গোস্বামী মহাশয়ের বয়স অষ্টাদশ বৎসর মাত্র। সাধু অঘোরনাথের জীবন বিজয়েরই অনুরূপ ছিল। এই দুই সাধুপ্রকৃতি যুবকের চরিত্রের সামঞ্জস্য থাকায় এই সময় হইতে অধিকাংশ সময় উভয়ে একত্র অবস্থান করিতেন। একই জন্মভূমির পবিত্রতাপূর্ণ জল প্রেমপূর্ণ পূত হিল্লোল এবং একই হরিনামের মাহাত্ম্য দুই বাল্যবন্ধুকে অপূর্ব্ব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিল। মহাকবি গাহিয়াছেন "প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।" যে শান্তিপুর চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতাদি ও

---

* বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে এই শিবালয়ের নানাবিধ সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

অন্যান্য ভক্তাবতারগণের পুণ্য প্রেম পরশে মহাপ্রেমের বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছিল সেই শান্তিপুর দুই স্বভাবসাধুর সম্মিলনে পুনরায় গৌরবান্বিত হইল। উভয়ের ধর্ম্মানুরাগ তাহাদের বাল্যবন্ধুতাকে সুদৃঢ় করিয়াছিল। ক্রমে উভয়ে একত্রে একই দিনে একই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জলন্ত উৎসাহ ও প্রবল অনুরাগে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভারতের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।





সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ ও বিবাহ।

নবীন যৌবনের অবিচলিত উদ্যম, বিপুল উৎসাহ ও সতেজ মন লইয়া বিজয় তাঁহার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্তের সহিত ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগরীতে আসিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময়ে কিছুকাল তিনি তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয়ের মাতুলালয়ে সাঁতরাগাছি গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রতিদিন তিন চার মাইল পদব্রজে অতিক্রমপূর্ব্বক নৌকারোহণে গঙ্গা পার হইয়া কলেজে আসিতে হইত। কতদিন ঝড় বৃষ্টির জন্য পথে ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে কিন্তু কিছুতেই এই গ্রাম্য যুবককে দমিত করিতে পারে নাই। অভিভাবকবিহীন যুবকগণের এ সময় কলিকাতা বাসকরা বড়ই বিপৎসঙ্কুল ছিল। ধর্ম্মবিহীন শিক্ষার প্রভাবে তখন ছাত্রগণ অত্যন্ত উদ্ধতপ্রকৃতি ও উন্মার্গগামী হইয়া পড়িতেছিলেন। যথেচ্ছ পান ভোজনকেও তাঁহারা সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। খৃষ্টীয় প্রচারকগণের হৃদয়গ্রাহী ও উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতাপ্রভাবে মুগ্ধ যুবকবৃন্দ দলে দলে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তদানীন্তন বঙ্গসমাজসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন "১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বিধবাবিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব,

সোম প্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নব শক্তি-সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটী বঙ্গসমাজকে প্রবল রূপে আন্দোলিত করিয়াছিল।"

এই সকল প্রবল তরঙ্গের মধ্যেও প্রথমতঃ তাঁহার মন ধীর, স্থির ও প্রশান্ত ছিল। তাঁহার স্বাভাবিক নিষ্ঠা ও ভক্তি তাঁহাকে পানদোষ প্রভৃতি তৎকালীন সর্ব্বপ্রকার পাপাচারের মধ্য হইতে দূরে রাখিত। সেই বিবিধ আন্দোলনসংক্ষুব্ধ কলিকাতা সহরে বাস করিয়া তখনও তাঁহার কণ্ঠে তুলসীমাল্য, মস্তকে শিখা ও ললাটে তিলকরেখা এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতোচিত অনুষ্ঠানাদিতে গভীর অনুরাগদর্শনে সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিতেন।

এই দারুণ সঙ্কট সময়ে রামময় ও কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য নামে তাঁহার দুইজন আশৈশব ও অন্তরঙ্গ বন্ধু খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার কুলপুরোহিত দিগ্বিজয়ী স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত নসিরাম শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র ছিলেন। বাল্যাবধিই ইঁহাদের উভয়ের স্বধর্ম্মে অতীব অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। এক্ষণে সেই বন্ধুদ্বয়ের স্বধর্ম্মত্যাগ ও অন্যান্য সঙ্গীগণের নানা প্রকারের ভাব ক্রমে ক্রমে তাঁহারও আচারিত ধর্ম্মবিশ্বাসে সংশয় ও কঠোর ব্রতানুষ্ঠানাদিতে অনাস্থা জন্মাইয়া দিতেছিল।

সংস্কৃত কলেজে পাঠকালে রামচন্দ্র ভাদুড়ীর কন্যা যোগমায়া দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের সময়, যোগমায়া দেবীর বয়স মাত্র ছয় বৎসর ছিল। পাছে দরিদ্র পরিবার বিপন্ন হয়, এই আশঙ্কায় জননী স্বর্ণময়ী সমারোহের সহিত পুত্রকে বিবাহক্ষেত্রে প্রেরণ করেন নাই। জ্যেষ্ঠ সহোদরসহ, একজন পরিচারক ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণময় গোস্বামী মহাশয় বরযাত্রিরূপে গমন করিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের মাতুলালয়ের পুরোহিতদ্বারাই উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। শুনিয়াছি

বরযাত্রসহ বরকর্ত্তা শান্তিপুরে আসিবার কালীন একখানি মাত্র শিবিকা সংগৃহীত হওয়ায় প্রত্যাগমন সময়ে একবার পাত্র শিবিকায় আরোহণ করিয়া গমন করেন আবার তিনি অবতরণ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শিবিকা আরোহণ করেন; এইরূপে তাঁহাদিগকে শান্তিপুর পর্য্যন্ত আসিতে হইয়াছিল। কৃষ্ণময় গোস্বামী মহাশয়ের বর্ণ যোগমায়া দেবীর জননীর বর্ণের সহিত সাদৃশ্য থাকার অপরাধে তাঁহাকে স্ত্রীলোকের ন্যায় অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া সমুদয় পথ শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ, আসিতে হইয়াছিল। বালিকা যোগমায়া সারা পথ জননীর জন্য কাঁদিতেছিলেন এবং ঐ অবগুণ্ঠনাবৃত কৃষ্ণময়কে তাঁহার জননীর স্থলাভিষিক্ত করিয়া "ঐ জননী আসিতেছেন" এই বাক্যে প্রবোধ প্রদান করিয়া ক্রন্দনবেগ প্রশমিত করান হইতেছিল। শান্তিপুরে সমারোহে পাকস্পর্শ সম্পাদিত হইলে বালিকা যোগমায়াকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করা হয়।

অভিভাবকবিহীনা, দারিদ্র্যক্লিষ্টা গোস্বামী মহাশয়ের বালবিধবা শ্বশ্রূঠাকুরাণী, ত্বদীয়া জননী ও কনিষ্ঠা কন্যাটিকে লইয়া এই সময় হইতেই গোস্বামী মহাশয়ের পরিবারভুক্ত হয়েন। এ কারণে বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে কৌতুক করিয়া বলিতেন, "বিজয় বিবাহে তিনটী জীবন্ত যৌতুক প্রাপ্ত হইয়াছেন"। যাহা হউক, দ্বিরাগমন সময়ে বালিকা যোগমায়া এই তিনটী জীবন্ত যৌতুক লইয়া, পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে আগমন করেন। এখন হইতেই এই ক্ষুদ্র বালিকার সহিত তাঁহার জীবনসূত্র গ্রথিত হইল।

তাঁহাদের বিবাহ যেন পুতুলের খেলা হইয়াছিল। উভয় সহোদর, সমবয়স্ক থাকায় তাঁহাদের হাস্য পরিহাসের বিরাম ছিল না। ভাসুর দেখিলে অবগুণ্ঠন প্রদান করিতে হয়, বালিকা যোগমায়া নগ্নাবস্থায় মাথায় কাপড় দিয়া বসিয়া থাকিতেন। কখনও কখনও ভাসুরকে দেখিয়া ক্রীড়াসক্তা বালিকা বস্ত্রের অনটন হেতু উলঙ্গ হইয়া, পরিধেয় বস্ত্রের দ্বারা

অবগুণ্ঠনবতী হইতেন। গোস্বামী মহাশয় অগ্রজকে পত্নীর লজ্জাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়া, হো হো শব্দে উচ্চ হাস্য করিতেন। কোন কোন দিন অবগুণ্ঠনাবৃতা নগ্না বালিকা যোগমায়াকে ভাসুরের স্কন্ধেও আরোহণ করিতে দেখা যাইত। গোস্বামী মহাশয় সহাস্যে বলিতেন, "দাদা! বেশ্ হয়েছে। এখন অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠটিকে লইয়া কণ্ঠের কবজ করিয়া রাখুন্।" বাস্তবিক তাহা যে না হইত এমন নহে। কোনও কোনও দিন জ্যেষ্ঠাকে পৃষ্ঠে ও কনিষ্ঠাটীকে কণ্ঠে ঝুলিতে দেখা যাইত।

কেবল যে অগ্রজকেই এই সকল সহ্য করিতে হইত, তাহা নহে। গোস্বামী মহাশয়কেও বড় কম উপদ্রুত হইতে হইত না। গোস্বামী মহাশয় পাঠ করিতেছেন, বালিকা পশ্চাৎ হইতে ধীর পদক্ষেপে আগমন করিয়া ক্ষুদ্র স্নেহ কোমল অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিয়া বিকৃত কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আমি কে, বল দেখি। গোস্বামী মহাশয় বলিতে পারিতেন কি না জানি না, তবে অগ্রজকে ডাকিয়া বলিতেন, "দাদা এ পুন্‌কে শত্রুকে লইয়া যাও ; আমার পড়া শুনা সব মাটী হল।" যখন ক্ষুদ্র হস্তদ্বয়ে কুলাইয়া উঠিত না, তখন বালিকা স্নেহশীতল ক্ষুদ্র বক্ষঃস্থল সংলগ্ন করিয়া উন্মুক্ত পুস্তকের উপর শয়িত হইতেন। পতিপরায়ণা ক্ষুদ্র বালিকা পাঠে নিবিষ্ট-চিত্ত পতির স্নানাহারের বিলম্ব দেখিয়া তৈল লইয়া ধীরে ধীরে পতির পশ্চাৎ দিক্ হইতে সর্ব্বাঙ্গে অনুলেপন করিয়া দিতেন। এই সময়ে তাঁহার বালিকাহৃদয়ের সমস্ত আবেগ, সমস্ত অকাঙ্ক্ষা তাঁহার ক্ষুদ্র বাহু দুইটীর উপর ভর করিয়া পতির জন্য অপেক্ষা করিত। অগ্রজকে এই সময় কনিষ্ঠের কতই না অভিযোগ শুনিতে হইত। ভ্রাতৃজায়া বালিকা যোগমায়াকে দেবরের ক্রোড়ে বসাইয়া হরগৌরীর অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিতেন। তখন কে জানিত, তাঁহাদের এই সাধের সংসারে কোন দিন বিচ্ছেদ ঘটিবে।

পুজনীয়া যোগমায়া দেবী গোস্বামী মহাশয়ের যোগ্যা পত্নী ছিলেন। পতির ধর্ম্মসাধনে আজীবন তাঁহাকে সহায়স্বরূপা দেখা গিয়াছে। ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী যেরূপ সাগরসঙ্গমে নিজের স্বাতন্ত্র্য, নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেয়, তিনিও সেইরূপ নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া পতির ভিতরে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন।

দেবী যোগমায়া নিরতিশয় মধুর-ভাষিণী ছিলেন, তাঁহার সুমধুর বাক্যে সকলের প্রাণে নির্ম্মল আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হইত। তিনি সদানন্দময়ী ছিলেন। বিষাদ তাঁহার নিকট স্থান প্রাপ্ত না হইয়া দূরে পলায়ন করিয়াছিল। চিরদিন তাঁহাকে ঘোর দরিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বদনমণ্ডলে একদিনের জন্যও বিষাদ পরিদৃষ্ট হয় নাই।

তিনি অতিশয় দয়াবতী ছিলেন। তাঁহার আত্মপর বোধ ছিল না। গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে সর্ব্বদা বহু ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি জননীর ন্যায় সকলকে পালন করিয়াছেন। মাতৃহীন ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট বসিলে জননীর অভাব বিস্মৃত হইত। আমরা কিন্তু তাঁহার স্নেহে মর্ম্মে মর্ম্মে মাতার অভাব অনুভব করিতাম।

তিনি চিরানন্দময়ী ছিলেন। নিয়ত অধরপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা অঙ্কিত থাকিত। ক্ষণকাল তাঁহার নিকট বসিলে মন প্রাণ স্নিগ্ধ হইয়া উঠিত। প্রীতি মূর্ত্তিমতী হইয়া যেন ধরাধামে যোগমায়ারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।





ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের সূচনা।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নসময়ে গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। হিন্দু শাস্ত্র, বিশেষতঃ বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি ঘোর বৈদান্তিক হইয়া পড়িলেন। এই মত এক্ষণে তাঁহার জীবনের ঘোরতর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। এতদিন কৌলিক ধর্ম্মা-চরণে তাঁহার যে ঐকান্তিক অনুরাগ, প্রবল বিশ্বাস ও অবিচলিত নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হইত, এক্ষণে তাহার অন্যথা হইল। যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে পূজার্চ্চনা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, তিনি এক্ষণে অদ্বৈত মতের ব্রহ্মবাদ গ্রহণ করিয়া পূজার্চ্চনার আবশ্যকতা অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেন। এ বিষয়ে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন। "হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঘোর বৈদান্তিক হইয়া পড়িলাম। তখন সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্ম, এই বিশ্বাস করিতাম। উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতাম না"।

তিনি এই ভাবে নেতি নেতি বিচার লইয়া শুষ্ক জীবন যাপন করিতে আসেন নাই। যাঁহার প্রেমামৃতধারায় স্নাত হইয়া সহস্র সহস্র নরনারী নিজেদের তাপিত জীবনকে সুশীতল করিবে; যাঁহার সাধনালোকে পাপীর চিরান্ধকারময় মলিন জীবন উজ্জ্বল ও প্রেমালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, তিনি কেন এরূপ কঠোর জীবন যাপন করিবেন। যে

মহৎ কর্ত্তব্যভার লইয়া তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহার দিকে তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্নপথে পরিচালিত হইল।

আম্‌লাগাছির জমিদারেরা গোস্বামী মহাশয়ের পৈতৃক শিষ্য; ঐ রাড়ীর কর্ত্রী শ্রীমতী জয়তারা চৌধুরাণী শ্রীগুরুপাট শান্তিপুর দর্শনে আসিয়াছিলেন। ভক্তিমতী শিষ্যা "যুগল-পূজা" করিবার অনুমতি ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিলেন। গোস্বামী মহাশয় প্রথমে অস্বীকার করায় ব্রজগোপাল তাঁহাকে বহুপ্রকারে বুঝাইয়া পরিশেষে সম্মত করিয়াছিলেন। সস্ত্রীক গোস্বামী মহাশয়ের চরণ-পূজা করিয়া শিষ্যা কেশদ্বারা উভয়ের শ্রীচরণ মুছাইয়া লইতে লইতে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি-উচ্ছ্বসিত সজল চক্ষে প্রার্থনা করিলেন প্রভো! আমি ভবসাগরে হাবু ডুবু খাইতেছি। আমাকে দয়া করিয়া উদ্ধার করুন। শিষ্যার কাতরোক্তি-শ্রবণে গোস্বামী মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন! মনে হইল আমি কিরূপে উদ্ধার করিব? আমার কি সে ক্ষমতা আছে? আমায় কে উদ্ধার করে তাহার নিশ্চয় নাই, আমি কিরূপে অপরকে উদ্ধার করিব? হায়! আমার ন্যায় নির্ব্বোধ আর দেখি না। দূর হউক আমি এ কপট আচরণ করিব না। আমি এ কার্য্য পরিত্যাগ করিব। মন নানাবিধ চিন্তাতরঙ্গে অধীর হইয়া উঠিল। সে দিন আর আহার করিতে পারিলেন না। অন্যান্য গুরুব্যবসায়ীর নিকট যাহা শ্রুতি-সুখকর হয়; তাঁহার নিকট তাহা তীব্র হলাহলের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক হইল। তিনি শিষ্যব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে দৃঢ় সংকল্প করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে গোস্বামী মহাশয় সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিবার জন্য তাঁহাদের গোপীনাথপুরের খামারে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে একদিন তিনি খামারবাড়ী হইতে (বরিশাল) গ্রামে যাইতেছিলেন। পথ মাত্র এক ক্রোশ ব্যবধান। পথিমধ্যে একটী তেঁতুলগাছ ছিল,

গোস্বামী মহাশয় সেই বৃক্ষের সমীপবর্ত্তী হইলে, এক দৈববাণী শ্রবণ করিলেন,—"বিজয়! পরলোক চিন্তা কর!" বহু অনুসন্ধান করিয়াও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কে বলিল?—কোথা হইতে বলিল, কিছুই নির্ণীত হইল না। কে তাঁহাকে অদৃশ্য অনিশ্চিত রাজ্যের অনুসন্ধানে আহ্বান করিল, বুঝিতে পারিলেন না। ভয়ে ও উদ্বেগে তাঁহার দেহ প্রবল জ্বরাভিভূত হইল।

পীড়াশান্তি হইল; কিন্তু তিনি শান্তি পাইলেন না। এতদিন তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে অনাহত বীণায় যে ঝঙ্কার উঠিতেছিল, কে যেন অলক্ষ্যে তাহার তন্ত্রী ছিঁড়িয়া দেওয়ায় বীণা আজ হঠাৎ বেসুরে বাজিয়া উঠিল। এই ঘটনা তাঁহার জীবন-নাট্যের পটপরিবর্ত্তনের স্থচনা করিয়া দিল।

